সায়েন্স ফিকশন

# যন্ত্রমানব ও অপারেটিং সিস্টেম

হিটলার এ. হালিম

৮৬৭
৬২
মা

# যন্ত্রমানব ও অপারেটিং সিস্টেম

হিটলার এ. হালিম

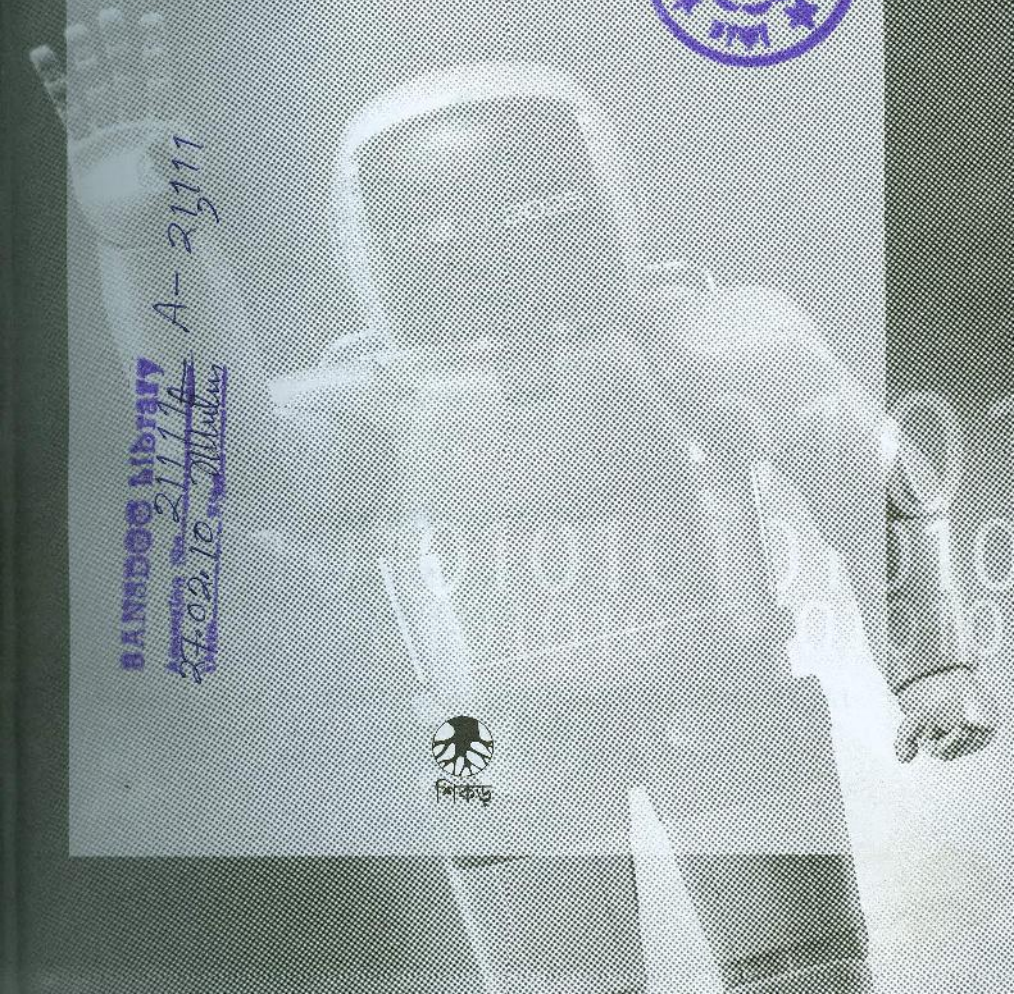



BANSDOC Library
Accession No. 21111
Date 27.02.10
A-21111

শিকড়

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০৯

স্বত্ব : লেখক

প্রকাশক : এম আর মিলন
প্রচ্ছদ : নিয়াজ চৌধুরী তুলি

শিকড় ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে
এম আর মিলন কর্তৃক প্রকাশিত
হেরা প্রিন্টার্স ২৭ শ্রীশদাস লেন
থেকে মুদ্রিত অক্ষর বিন্যাসে
শিকড় কম্পিউটার্স
ফোন ৭১১৬০৫৪

**দাম ১৫০ টাকা মাত্র**

Price Taka 150 Only
US $ 3 Only

JANTRAMONOB 'O' OPERATING SYSTEM (A Science Fiction)
by Hitlar A. Halim Published by M R Milon
of Shikor 38 Banglabazar Dhaka

ISBN 984 760 119 4

প্রতি সেকেন্ডে তার আয় ৩০০ ডলার!

কোনো কারণবশত যদি তার হাত থেকে ১০০০ ডলার ঘরের মেঝেতে পড়ে যায় তাহলে ওটা তোলার জন্য তিনি চেষ্টাও করবেন না। মেঝে থেকে ওটা তুলতে তার ৪ সেকেন্ড সময় ব্যয় হবে। ততক্ষণে তিনি ১২০০ ডলার আয় করে ফেলবেন। তিনি যে দেশে থাকেন সে দেশের সরকার বিভিন্ন ব্যাংক, এনজিও সংস্থার কাছে প্রায় ৫.৬২ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণী। যদি তিনি চান, তাহলে এই অর্থ মাত্র ১০ বছরেরও কম সময়ে পরিশোধ করতে পারবেন।

যদি পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষকে তিনি ১৫ ডলার করে দান করেন তারপরও শেষ পর্যন্ত তার হাতে খরচ করার জন্য ৫ মিলিয়ন ডলার অবশিষ্ট থাকবে। তার যে পরিমাণ অর্থ সম্পদ আছে, সেগুলো যদি একটি দেশের মোট সম্পদের পরিমাণের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে তিনি হবেন পৃথিবীর ৩৭তম ধনী দেশ। তার মোট সম্পদের পরিমাণকে যদি ১ ইউএস ডলারের নোট করা যায় তাহলে পৃথিবী থেকে চাঁদে ১৪ বার আসা-যাওয়ার রাস্তা তৈরি করা যাবে। এই রাস্তা তৈরি করতে মানুষের লাগবে ১৪০০ বছর। এই পরিমাণ নোট পৃথিবী থেকে চাঁদে বহন করতে মোট ৭১৩টি বোয়িং ৭৪৭ প্লেন লাগবে।

যারা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করেন তারা যদি প্রতিবার উইন্ডোজের কারণে সৃষ্ট কম্পিউটার হ্যাং হওয়ার জন্য তাকে ১ ডলার করে জরিমানা করেন তাহলে ৩ বছরের মধ্যে তিনি দেউলিয়া হয়ে যাবেন।

২০২৪ সাল।

আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কার কথা বলছি। তবুও বলি, তিনি হলেন বিল গেটস। তার সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি বলার দরকার নেই। সবাই তাকে

চেনেন। বিল গেটসকে সবাই ভালো মানুষ, দানশীল, সর্বোপরি একদা পৃথিবী শীর্ষ ধনী ব্যক্তি বলেই জানেন। এই বিল গেটস এক ভয়ঙ্কর কুটিল বুদ্ধি এঁটেছে।

কি সেই কুটিল বুদ্ধি?

বিল গেটস পৃথিবীর সব কম্পিউটার অকেজো করে দিতে চান! এজন্য তৈরি করতে যাচ্ছেন নতুন একটি অপারেটিং সিস্টেম। 'ভ্যানিলা স্কাই' নামের সে অপারেটিং সিস্টেম একটা সময় তামাম দুনিয়ার সব কম্পিউটার অচল করে দেবে।

কিন্তু কেন? বিল গেটস কেন এই সর্বনাশা খেলায় মেতেছেন।

কি তার মতলব?

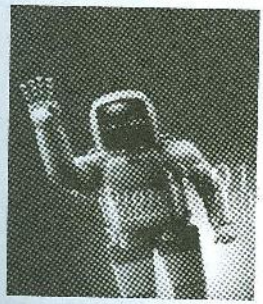

বিল গেটসের মাইক্রোসফটের সব ব্যবসা জলে যেতে বসেছে। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম আর চলছে না। কেউ ভুলেও ওটা কম্পিউটারে ইনস্টল করছে না। ভিসতাও সেভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি। ব্যবসায় লস দিতে দিতে, একের পর এক মামলায় হেরে বিপর্যস্ত মাইক্রোসফট দেউলিয়া হতে বসেছে। এখন কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি। দেনার দায়ে আকণ্ঠ ডুবে গেছেন বিল গেটস।

জানুয়ারির প্রথম সকালে বিল গেটস মাইক্রোসফটের অফিসে মন খারাপ করে বসে আছেন। সকাল ১০টা বাজে, এখনো নাস্তা খাওয়া হয়নি তার। সকালে গোসলও করা হয়নি, বাড়িতে পানি নেই। দু'দিন হলো বাড়ির পানির লাইন কাটা। তাই দাড়ি কামানো হয়নি। তিনদিন ধরে ঘরে বাজার নেই, তাই সকালের নাস্তাও জোটেনি।

বিল গেটস তার চেয়ারে হেলান দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে, চোখ বুঁজে আছেন। এমন সময় তার পোষা মানবীয় রোবট আসিমো নিঃশব্দে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তার হাতে পানি ভর্তি গেলাশ। আসিমো কোনো কথা বলছে না। দাঁড়িয়েই আছে, শব্দ করলে পাছে তার মনিবের ঘুম ভেঙে যায়।

বিল গেটস মাথা চোখ মেলে দেখলেন আসিমো তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। 'কিরে কিছু বলবি?'

'আপনার পানি।'

'সকালে খালি পেটে পানি খাওয়া কি ঠিক হবে? কৌটোর মধ্যে কোনো নোনতা বিস্কুট আছে কি না দেখতো?'

আসিমো ড্রয়ার খুলে একটা বড় টিনের কৌটা বের করে বিল গেটসের হাতে দিল। বিল গেটস কৌটোর মুখ খুলে দেখেন দু'টো নোনতা বিস্কুট নিচে পড়ে আছে। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যাক দুপুর পর্যন্ত পেটে কিছু না দিয়েও কাটানো

যাবে, মনে মনে ভাবলেন তিনি। বিল গেটস খুব আগ্রহ নিয়ে পানিতে ভিজিয়ে বিস্কুট খাচ্ছেন। পাশে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে আসিমো।

'কিরে, তোর আবার কি হলো? মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোর তো খাওয়ার চিন্তা নেই। প্লাগটা সুইচ বোর্ডে ঢুকিয়ে দিয়ে বসে থাকবি। পেট ভরে [চার্জ] যাবে, তাই না?'

'না কই, আমার আবার কি হবে?'

'অফিসের বিদ্যুৎ লাইন কাটেনি। দুই মাস পরে কাটবে। দুই মাস তোর খাওয়ার মানে চার্জের কোনো চিন্তা নেই।'

'আমিতো আমার কথা ভাবি না। আমি চিন্তিত আপনাকে নিয়ে। এভাবে আর ক'দিন চলবেন? ঘরে বাজার নেই, পানি নেই। এভাবে বাঁচা যায়?'

'দেখা যাক ক'দিন চলে।' বিল গেটসের বুক চিরে বড় একটা শ্বাস বের হয়ে এলো। আবারো তিনি আধশোয়া হলেন। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই সব স্বর্ণালী দিন। ...একে একে সবাই তাকে ছেড়ে গেছে। সব শেষে গেছে মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা স্টিভ বালমোর। বিল গেটস ভেবেছিলেন সবাই তাকে ছেড়ে গেলেও বালমোর কখনো যাবে না। সেও থাকেনি, চলে গেছে।

এখন আসিমোই বিল গেটসের একমাত্র অবলম্বন। সে তাকে ছেড়ে যায়নি বলে বিল গেটস বেশ অবাকই হয়েছেন। তাছাড়া আসিমো যাবেইবা কোথায়। বিল গেটস তাকে বছর পাঁচেক আগে জাপান সফরে গিয়ে কিনে এনেছিলেন।

তখনো বিশ্বে মানবীয় রোবট আসেনি। জাপানে গিয়েই তিনি জানতে পারলেন সনি কোম্পানি প্রথম মানবীয় রোবট তৈরি করেছে। যদিও কোম্পানিটি মানবীয় গুণসম্পন্ন আসিমোকে বিক্রি করতে চায়নি কিন্তু বিল গেটস ওটাকে কেনার আগ্রহ দেখালে প্রতিষ্ঠানটি আর না করেনি। তারপর একদিন বিল গেটসের নিজস্ব বিমানে করে আকাশ ভ্রমণ শেষে আসিমো এলো আমেরিকায়। ঠাঁই হলো বিল গেটসের অফিসে।

আসিমো আসার পরে বিল গেটসের ব্যক্তিগত সহকারীকে অন্য বিভাগে সরিয়ে দিয়ে আসিমোকে করা হলো তার সহকারী। তারপর থেকেই আসিমো বিল গেটসের সব কাজই করে থাকে, ফুটফরমায়েশ খাটে। বিল গেটস আসিমোর কাজে শতভাগ খুশি। তাইতো তাকে চোখের আড়াল করতে চায় না। তাকে পরম বিশ্বস্ত বলে জানে। আসিমো তা বুঝতেও পারে।

বিল গেটস আসিমোকে বারকয়েক বলেছিলেন, 'আমি না থাকলে তুই অফিস চালাবি'। সে কেবল খালি মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলো। আসিমোর পেছনের কথাগুলো আবার মনে পড়ে গেল।

'কিরে তুই এখনো যাসনি।' বিল গেটস আধশোয়া থেকে আবার মাথা তুললেন।

'একটা কথা বলব?' আসিমো মুখ খুলল।

'কথা বলবি, সে জন্য তোকে অনুমতি নিতে হবে?'

'পুরনো নিয়ম, ভুলি কি করে।'

'সেদিন কি আর আছে? যেদিন ছিল সেদিনতো গেছে! ওই কথা মনে রেখে কি লাভ। ভুলে যাওয়াইতো ভালো।'

'না, আমার মনে হয় এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি। ওইসব দিন আবারো ফিরিয়ে আনা সম্ভব।'

বিল গেটস ম্লান হাসলেন। 'যে প্রতিষ্ঠান দেনার দায়ে ডুবতে বসেছে। ব্যাংক আজ বাদে কাল আমাকে দেউলিয়া ঘোষণা করবে। আর তুই বলছিস আবার ওইসব দিন আবার ফিরিয়ে আনা যাবে!'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আপনি ব্যাংকের কাছে ৬টা মাস সময় চান। আপনি এক সময় ব্যাংকগুলোকে চালিয়েছেন। কখনো তাদের তারল্য সংকটে পড়তে দেননি। এ আবেদন নিশ্চয় ব্যাংকগুলো শুনবে। একবার বলেই দেখেন না।'

বিল গেটস নড়েচড়ে বসলেন। 'বল দেখি তোর মাথায় কি সেই রোমান্টিক ম্যাকানিজম এলো যার কারণে তোর মনে হচ্ছে সবকিছু আবার আগের মতো হয়ে যাবে?'

'আপনি নতুন করে আরেকটি অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করেন। সেটা দিয়েই আপনি আবার হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে পারেন।'

'নারে, আমার আর সেই মানসিকতা নেই। অতো পরিশ্রম করার মতো শারীরিক সক্ষমতাও নেই। তুই এ প্রসঙ্গ বাদ দে।'

'আপনি যদি কষ্ট করে আমার পুরো পরিকল্পনাটা শোনেন তাহলে আপনাকে বোঝাতে সহজ হয়।'

'আচ্ছা, সংক্ষেপে বল' বিল গেটসের গলার স্বরে আসিমো বুঝলো তার শোনার আগ্রহ কম। সে দ্রুত গুছিয়ে নিলো কিভাবে বলবে।

'কিরে শুরু কর।'

'আপনি একটা নতুন অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করেন। এটা তৈরি করতে সময় লাগবে চার মাস। এটা বাজারে ছাড়তে হবে মে মাসে। একেবারে নামমাত্র দামে এটা বাজারে ছাড়তে হবে। এটাতে বিল্ট-ইন থাকবে অ্যান্টিভাইরাস। এ কারণে এটা বিক্রি হবে মোটামুটি। এ সফটওয়্যারের ইন্টারনেট ভার্সনও থাকবে। অপারেটিং সিস্টেম বাজারে ছাড়ার দুই বছর পরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এটাতে সুপ্ত বিস্ফোরণ ঘটবে।

যেসব কম্পিউটারে এ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হবে সেগুলো পুরোপুরি অকেজো হয়ে যাবে। আর যেসব কম্পিটারে এ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হবে না সেগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে অনলাইন থেকে স্বংক্রিয়ভাবে ইনস্টল হয়ে যাবে এ অপারেটিং সিস্টেম। যেসব কম্পিউটারে উইন্ডোজ চালু থাকবে সেগুলো কেন্দ্রীয় সার্ভারে প্রোগ্রামিং করার কারণে কম্পিউটার আপডেট চাইবে, আপডেট করা না হলে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ওই কম্পিউটার আর চলবে না। তাই সেগুলোতে ইন্টারনেট থেকে অপারেটিং সিস্টেম আপডেট করে নিতে হবে।

যেসব কম্পিউটারে অন্য অপারেটিং সিস্টেম চলে সেগুলো ওইসব অপারেটিং সিস্টেমের নিরাপত্তা কোড ভেঙে নতুন অপারেটিং সিস্টেমে অচল করার কোড পাঠানো হবে। সুতারাং এসব কাজের মাধ্যমে পৃথিবীর সব কম্পিউটার এতে করে অচল করা যাবে। তখন কম্পিউটার সচল করতে পারবে কেবল উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম। অন্য কোনো অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারে চলবে না। এমন প্রোগ্রামিং করবো যাবে বিশ্বের কোনো প্রোগ্রামার এ প্রোগ্রাম ভেঙে কম্পিউটার চালু করতে পারবে না। সবাইকে তখন বাধ্য হয়ে উইন্ডোজ কিনতে হবে। তখন হবে আপনার দিন। আপনি উচ্চ মূল্যে উইন্ডোজ বিক্রি করবেন।' আসিমো থামল।

বিল গেটসের মুখে একটা উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়েছে। তার চোখ চকচক করছে। আসিমো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তা।

'বলিস কি! এসব কিভাবে সম্ভব?' বললেন বিল গেটস।

'সম্ভব। আমি সব ভেবে রেখেছি।' আসিমোর ছোট্ট জবাব।

আমি আহির। আহির আবেদ। বাংলাদেশের রাজধানীতে আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা। বাবা মায়ের প্রথম সন্তান হওয়ায় সবার আদরে আদরে বড় হয়েছি, তবে বাঁদর হইনি। পড়াশোনা করেছি বুয়েটে, কম্পিউটার বিজ্ঞানে। কম্পিউটারের সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি মজা পাই প্রোগ্রামিংয়ে। অনেকে আমাকে 'হ্যাকার' বলে কিন্তু আমি নিজেকে 'হ্যাকার' মানতে রাজি নই। তবে, মাঝে মধ্যে আমি দুয়েকটি কোম্পানির সুরক্ষিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে ওদের তথ্য জেনে নিয়েছিলাম। এতে করে ওদের বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে উপকার হয়েছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফাউল মিয়ার।

বন্ধু ফাতাউলকে আমরা ডাকতাম ফাউল মিয়া। ওর নাম ভেঙেই আমরা ওকে ওই নামে ডাকতাম। ফাতাউল থেকে 'তা' বাদ দিয়ে আমরা ডাকতাম ফাউল মিয়া। ফাউল মিয়া ডেকে বেশ মজা করতাম, হাসাহাসি করতাম। ফাতাউল কিছু মনে করতো না। ও মজা পেত] ওর ভালো একটা চাকরি হয়েছিল। মাইনেও ছিল মোটা অংকের। তবে ফাতাউল ছিল বোকা কিছিমের। ভালো বুঝে কোনো কাজ করতে গেলে শেষমেষ গুবলেট পাকিয়ে ফেলাটা তার অভ্যেসে পরিণত হয়েছিল। হ্যাকিংয়ের গোপন খবরটা ফাউল মিয়াই একদিন ফাঁস করে দেয়।

ঘটনাটা ফাঁস হয়ে যাওয়াতে বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল আমাকে। খবরের কাগজে ছবিসহ সংবাদটা ছাপা হলে চারদিকে বেশ হৈচৈ হয়েছিল। পথে বের হলে মাঝে মধ্যে বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হতো। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গেলে প্রশ্নকর্তারা ওই ঘটনাটা কিভাবে ঘটিয়েছিলাম তা আগে জানতে চাইতেন। আমি পাংশুটে মুখে তা বলে যেতাম, আর ওনারা বেশ তারিয়ে তারিয়ে ঘটনাটা উপভোগ করতেন। ফলাফল, আমার চাকরি হতো না।

একদিন বাসায় বসে আছি এমন সময় ফাউল মিয়া আমার পাশে চেয়ার টেনে বসল। এমনভাবে চেয়ারটা টানল যাতে কোনো শব্দ না হয়।

ও চুপচাপ বসে আছে। কোনো কথা বলছে না, বলবেও না। ও এরকমই, বিরক্ত করে না। সব সময় মিইয়ে থাকে। ওর তাকানো দেখলে মনে হয়, সে আমার কাজ দেখছে, কাজ দেখে আনন্দ পাচ্ছে।

ওকে দেখলেই আমার বিরক্ত লাগা শুরু হয়। কেন, ও এসে বসে থাকবে কেন? ঝামেলা পাকিয়ে এখন এসেছে খাতির করতে। আমার মেজাজ খারাপ হতে শুরু করে। হাত-পা নিশপিশ করে। ঘনঘন পানি পিপাসা হয়। এটা ফাউল মিয়া বোঝে না। ও বসে থেকে আমার লেখা দেখে, কাজ দেখে। মনে হয় ও আমার এসব দেখেই মুগ্ধ। কথা না বললে কোনো সমস্যা হবে না। এভাবে থাকবে, ঠিক ৩০ মিনিট পরে মিনমিন করে 'দোস্ত আমি যাই' বলেই হনহন করে দরজা পর্যন্ত যাবে। একবারও পেছন ফিরে দেখবে না। দরজার কাছে গিয়ে জুলুজুলু চোখে আমার দিকে তাকাবে।

ওর ওই তাকানোর দৃশ্যটা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় এ রকম, 'দোস্ত, একবার বল, থেকে যাই।' আমি বলি না। ফাউল মিয়া চলে যায়। ও চলে গেলেও আমার মেজাজ আরো খারাপ হয়। কেন, ও এতো তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন। কি এমন ব্যস্ততা। আর দু'টো মিনিট বসলে কি ক্ষতিটা হতো। আমি মেজাজ খারাপ করে বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়াই। স্টলে চায়ের অর্ডার দিই। হঠাৎ পাশ থেকে ফাউল মিয়া এসে বলে 'আমার জন্য চায়ের অর্ডার দিতে হবে না, তুই খা আমি দেখি।'

আমি ওর জন্য চায়ের অর্ডার দেই। চায়ের কাপ হাতে ও দাঁড়িয়ে থাকে। কাপের মধ্যে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করে। ফাউল মিয়া খুশিতে আটখানা হয়ে বলে, 'এই এক কাপ চায়ের জন্য তোর কাছে আসি।' চা শেষ হলে কাপটা নামিয়ে রেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে ও চলে যায়।

ফাউল মিয়ার মোবাইলে একদিন ফোন দিলাম।

কিরে কি করিস?

ও প্রান্ত থেকে ফাউল মিয়ার জবাব, 'বসে আছি।'

'কোথায়?'

'বাসের মধ্যে, পেছনের সিটে।'

'বাসটা কোথায়?

'রাস্তায়!'

আমার তো মেজাজ খিঁচে ওঠার যোগাড়। 'ব্যাটা রসিকতা করিস?'

'রসিকতা না হয় একটু করলাম। চটছিস কেনো, বাসতো আকাশে থাকবে না, থাকবে রাস্তায়।'

'খচ্চর কোথাকার। তা রাস্তায় যে বললি, সেটা কোথায়?'

ফাউল মিয়া মিনমিন করে উত্তর দিল, 'রাস্তার মাঝখানে। রোড ডিভাইডারের কাছে।'

আমার তো ততক্ষণে মাথায় রক্ত চড়ে গেছে, 'বাপ দয়া করে বল, তুই যে বাসটায় আসছিস সে বাসটা এখন কোন এলাকায়?'

ফাউল মিয়া এবার আরো শীতল গলায় জবাব দিল, 'দোস্ত এই এলাকার নামটাতো জানি না।'

'তুই দয়া করে ওই এলাকার একটা বর্ণনা আমাকে দে। তোকে আমার খুবই দরকার।'

'দরকার যখন অপেক্ষা কর। আমি বাসে আসছি। বাস যতক্ষণে নিয়ে আসে আসব।'

ফাউল মিয়ার একথা শুনে আমি রাগতে গিয়ে রাগতে পারলাম না। ফের বলি, 'তোর বাস কোন এলাকায় আছে আমাকে নামটা বল।' ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে যাচ্ছি। মোবাইলের টাকা কাটা যাচ্ছে।

ফাউল মিয়ার একই জবাব, 'জায়গাটার নাম জানি না, বাস থেমে আছে। চলন্ত অবস্থায় থাকলে এতোক্ষণে কোনো নামঅলা জায়গায় থাকতাম। এলাকার একটা বর্ণনা দিই শোন। আমার ডানদিকের যে মোড় ওই মোড়টা থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে কাকরাইল আর বেইলি রোডের দিকে। পেছনে কাকরাইল মসজিদ। সামনে শেরাটনের পাশের রাস্তার প্রবেশ মুখ মানে হেয়ার রোড। এ জায়গার কোনো নাম জানি না। তুই একটু খোঁজ নেতো এ জায়গাটার নাম কি? নামবিহীন জায়গায় আছি ভাবতে খারাপ লাগছে। নো ম্যানস ল্যান্ডের কথা শুনেছি, নো নেমস ল্যান্ডের কথা শুনিনি। জায়গার নামটা জেনে আমাকে জানা।'

বুঝলাম ফাউল মিয়া কোথায় আছে। 'আমি ফার্মগেটে আনন্দ সিনেমা হলের সামনে আছি, তুই আয়। ফাউল মিয়া নিরাসক্ত গলায় বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করবি, বাদাম খা।'

নিকুচি করি তোর বাদাম খাওয়ার। মোবাইলের লাইন কেটে দিলাম। আধঘন্টা পরে বাস থেকে নামল। নামতে গিয়েই পড়ল একটা চলন্ত বাসের সামনে। কোনো মতে নিজেকে সামলে সরে এলো একপাশে। বাস ড্রাইভার ফাউল মিয়াকে 'এই কানা শুয়োর' বলে গালি দিল।

ফাউল মিয়াও খেঁকিয়ে উঠল, 'আমি না, তোর বাপ।'

আমি ফাউল মিয়ার জবাবে খানিকটা অবাক হলাম। ওর সারামুখ জুড়ে একটা দুষ্ট হাসি। কি দরকার যে তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, তার সে কোনো ধারও ধারল না। একবার বলল, ও তুই এখনো আছিস। কেন যেন ওকে সন্দেহ হলো! মেজাজ খারাপের চোটে ওর সাথে কোনো কথা না বলে বিদায় হলাম।

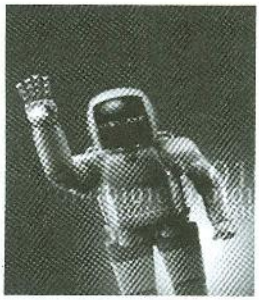

ফাউল মিয়া হঠাৎ ডুব মেরেছে। ও এ রকম প্রায়ই করে। কোনো খোঁজ থাকে না। ওর অফিসে খোঁজ নিতেই জানলাম তিন দিনের ছুটি নিয়েছে। কোথায় গেল ও।

ও একদিন আমার কাছে না এলে খারাপ লাগে, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ও যে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে সেটা খালি থাকে। বারবার ওদিকে চোখ যায়। হাতে একটা কাজ ছিল সেটা সেরে রাত ৯টায় পৌঁছলাম ফাউল মিয়ার মেসে। মেস বলতে পাঁচ তলার ছাদের একটা কামরায় ও এক বন্ধুর সঙ্গে থাকে। পুরো ছাদটা ব্যবহার করে।

বিদ্যুৎ নেই। জোছনা রাতে ফাউল মিয়া ছাদে বসে আছে। দূর থেকে দেখলাম ও কি যেন করছে। কাছে যেতেই দেখি ওর হাতে একটা পানিভর্তি গ্লাস আর একটা বড় বোল। গ্লাসের ভেতর আকাশের চাঁদ ও ছায়া নিয়ে খেলছে। খানিকক্ষণ এভাবে দেখে শেষমেশ প্রশ্ন করেই ফেললাম। ও আমার দিকে না ফিরে যে উত্তর দিল তা শুনে আমিও চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ফাউল মিয়া বলল, 'বুঝলি একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছি। ওর নাম শশী। এ নামের অর্থতো জানিস, চাঁদ। কিন্তু কিছুতেই ওকে বাগে আনতে পারছি না। অথচ দেখ দেখ কতো সহজে আমি চাঁদকে গ্লাসের মধ্যে আনতে পারছি। বোলের মধ্যে ধরতে পারছি। কিন্তু বাস্তবে কিছুতেই ধরতে পারছি না।'

দেখি, বোলের পানির ভেতর চাঁদ দেখা যায়। ফাউল মিয়া বোলের পানিটা একটু নাড়িয়ে দিতেই চাঁদটা পানির ভেতর একটু একটু করে কাঁপতে থাকে। ও গলায় উদাসী সুর টেনে বলল, 'আমি অনেক চেষ্টা করেও ওর হৃদয়টা কাঁপাতে পারছি না।'

ফাউল মিয়া গান গাইছে, 'আমি যামিনী তুমি শশী হে, ভাসিছ গগনও মাঝে।'

দিন দুয়েক পরের কথা। ফাউল মিয়ার সঙ্গে দেখা। দেখি ও চাঁদ বগলদাবা

করে হাঁটছে। চাঁদ ও গায়ে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল ওরা! ফাউল মিয়া পরিচয় করিয়ে দিল মেয়েটির সঙ্গে।

সপ্তাহ দুয়েক পর ফাউল মিয়া এসে আমার পাশের চেয়ারটায় বসলো। আগের মতো। হঠাৎ ফাউল মিয়া বলে উঠল, দোস্ত, আজ ঈদের চাঁদ দেখা যাবে। চল, তোদের ছাদে যাই। ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। পশ্চিম আকাশে তাকিয়ে আছি। ভাবলাম ফাউল মিয়া তো চাঁদ ধরেই ফেলেছে। তাই এবার গ্লাস বা বোল নয়, সরাসরিই দেখছে। চাঁদ দেখতে পেলাম। ফাউল মিয়াও দেখছে, তবে কোনো উৎসাহ নেই ওর ভেতর। উদাস গলায় বলল, দেখেছিস ঈদের চাঁদটা কেমন বাঁকা। আসলে শশী বোধ হয় এমনই। কেবলই বেঁকে যায়। চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে।

কি বলে ও! চাঁদ দেখা বাদ দিয়ে ফাউল মিয়াকে দেখি।

ফাউল মিয়া বলল, আমাদের সম্পর্কের ১২ দিনের মাথায় শশী ১৫ হাজার টাকা ধার চাইল। টাকাটা দেয়ার পর থেকে শশীর কোনো খোঁজ নেই, মোবাইল বন্ধ। আজকে কুরিয়ারে একটা চিঠি পেলাম, সম্পর্ক শেষ করে দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছে! ছোটবেলার একটা ঘটনার কারণে চাঁদ দেখা বন্ধ করেছিলাম। চাঁদের সঙ্গে প্রেমে পড়ার পরে আবার ঈদের চাঁদ দেখার সাধ হয়েছিল। চাঁদটা দেখলাম বটে তবে এখন আর চাঁদ আমার না।

কি ছিল ছোটবেলার সেই ঘটনাটা। ফাউল মিয়ার স্মৃতিটা উসকে দিলাম। ও স্মৃতিতে খুলে গেল ছোটবেলার তার নিজের গ্রাম।

ফাউল মিয়া বলছে, শুনলাম ঈদের চাঁদ উঠেছে। বাড়িতে গাছপালা থাকায় পশ্চিম আকাশে চাঁদ দেখা যেত না। যেতে হবে নদীর পাড়ে। দৌড়ে গেলে সময় লাগবে অনেক। তাই সাইকেল নিয়ে বের হলাম। তাড়াহুড়ো করে চালাতে গিয়ে সাইকেলের নিচে চাপা পড়ে প্রতিবেশীদের একট হাঁস মারা গেল।

হৈ হৈ করে তেড়ে এলো ওরা। চাঁদ দেখা শিকেয় উঠল আমার। ওদের সঙ্গে এমনিতেই আমাদের পুরনো শত্রুতো। এবার তো ওরা ঝেড়ে কাশবে। পকেটে টাকা ছিল। হাঁসের দাম দিতে চাইলাম, ৭০ টাকা। হনুমানমুখো বাড়িঅলা বলল,

'হাঁসের দাম ৭০ টাকা ঠিক আছে। তাই বলে ৭০ টাকা দিলেতো হবে না। এই হাঁস বেঁচে থাকলে কমপক্ষে ২০০ ডিম দিত। ওই ডিমের দাম ৬০০ টাকা। ২০০ ডিম থেকে বাচ্চা হলে প্রতিটার দাম হতো ৭০ টাকা। তাহলে ২০০ হাঁসের দাম ১৪ হাজার টাকা। ওই হাঁসগুলো প্রতিটা ২০০ করে ডিম দিলে...এ পর্যন্ত যেতেই থামিয়ে দিয়ে লোকটিকে বললাম থাক, অনেক বলেছেন।

হনুমানমুখো লোকটি বলল ঠিক আছে। এ পর্যন্তই থাক। তাহলে হিসাব কষে দাম হলো ১৪ হাজর ৬৭০ টাকা। এই টাকা না দিলে তোমাকে ছাড়ছি না।

ওরা আমাকে বেঁধে রাখল। এই নিয়ে অনেক হৈ হাঙ্গামা হলো, সালিশ বিচার

বসল। ঈদের দিন ১০ হাজার টাকা দিয়ে দফারফা হলো। বাড়ি এলাম, বন্দীদশা থেকে। বাড়ি এসে কি কি হলো তা শুনিস না। লজ্জায় সেই যে বাড়ি ছাড়লাম।

দোস্ত, এই দেশে গাড়ি বা সাইকেল চাপা পড়ে হাঁস মরলে মানুষ টাকা চায়। গাড়ি চাপা পড়ে মানুষ মরলে চায় না। ফাউল মিয়ার চোখে পানি টলমল করছে।

আমি ফাউল মিয়াকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললাম, 'থাক আর দুঃখ করিস না। বাদ দে ওসব। নতুন করে সবকিছু ভাবতে শুরু কর।'

শোন, তোর জন্য একটা খবর আছে। ফাউল মিয়া বলল।

আবার কি খবর?

ফাউল মিয়া বলল, আছে আছে। জব্বর একখান খবর আছে। শুনলে টাসকি খাইবা।

কি খবর বাপ? হেঁয়ালি করিস না। ঝেড়ে কাশ।

ফাউল মিয়া যে খবর আমাকে দিল তা শুনে আমার মাথার চুল সব খাড়া হবার যোগাড়। ওর মাথায় এ বুদ্ধিটা এলো কিভাবে? আর ও বুঝলই বা কিভাবে?

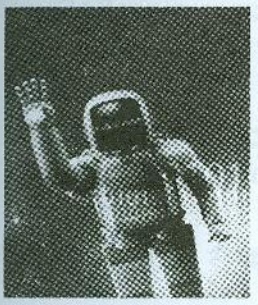

ফাউল মিয়া বলল, জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ আর কাজ করবে না। ওটার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

বলিস কি?

ফাউল মিয়া বলল, ঠিকই বলছি। বাসায় গিয়ে দেখ, তোর কম্পিউটার অচল।

বাসায় ফিরে কম্পিউটার অন করতে গিয়ে দেখি অন হয় না। গত রাতেও ঠিক ছিল। মনে মনে বললাম আমি। অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। উপায়ান্ত না দেখে ফোন দিলাম ফাউল মিয়াকে।

ও একটা ফিচেল হাসি দিয়ে বলল, 'মিয়া কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস দিলা আর জানলা না কবে কি শাট-ডাউন হবে। উইন্ডোজ গেলো রাতে সবার কম্পিউটারে ক্র্যাশ করেছে। ওটা আর ইহজনমে ঠিক হবে না।'

তুই জানলি কিভাবে?

আমি কিভাবে জানলাম সেটা বড় কথা না, এখন ব্যাপার হলো নতুন অপারেটিং সিস্টেম লাগবে।

তোর কাছে নতুন কোনো অপারেটিং সিস্টেম আছে?

কোনো অপারেটিং সিস্টেম এখন কম্পিউটারে চলবে না। সব অচল। ফাউল মিয়া বিজ্ঞের মতো সব বলে যাচ্ছে। 'দু'দিন অপেক্ষা করি। দেখি মাইক্রোসফট কোনো ঘোষণা দেয় কিনা। আচ্ছা এখন ফোন ছাড়ছি।'

খটাস করে ফোনের রিসিভার রেখে দিল ফাউল মিয়া।

ভাবনায় পড়ে গেলাম। এখন কি হবে। কম্পিউটার ছাড়াতো আমি অচল। এখন যদি কম্পিউটারই অচল হয়ে পড়ে থাকে তাহলে কিভাবে চলবে। মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বসলাম। পাতা ওল্টাচ্ছি। ছবি দেখছি। কোনো খবর নেই পড়ার মতো। একটা খবরে এসে চোখ আটকে গেল।

উইন্ডোজ শাট-ডাউন! : *তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বিপর্যয়*

মাইক্রোসফটের বহুল আলোচিত অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ গত সন্ধ্যা ৬টায় সারা বিশ্বের সব কম্পিউটারে একযোগে ক্র্যাশ করেছে। এতে করে বিশ্বের অসংখ্য কম্পিউটার অচল হয়ে পড়েছে। ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে। তবে উইন্ডোজ ছাড়া অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলড কম্পিউটার অচল হয়নি। এগুলো সচল আছে, থাকবে।

মাইক্রোসফট করপোরেশন সূত্রে জানা গেছে, উইন্ডোজ আর কখনো সচল হবে না। গতকাল পর্যন্তই ছিল এর মেয়াদ। এজন্য মাইক্রোসফট তথ্যপ্রযুক্তি প্রেমীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

মাইক্রোসফট শিগগিরই উইন্ডোজের আদলে আরেকটি অপারেটিং সিস্টেম বাজারে ছাড়বে। কবে, কখন তা এখনো জানা যায়নি।

ফাউল মিয়া বাসে উঠেই ধাক্কাটা খেল। তবে অক্কা পাওয়ার মতো ধাক্কা নয়। সে ধাক্কা খেল তার নিজের চোখের সঙ্গে! একি দেখছে সে। ২১ নম্বর সিটে এক রূপসী বসে আছে। পাশের ২২ নম্বর সিটটা খালি। অবশ্য পেছনের লম্বা সিটটা খালি পড়ে আছে। এখানে বসলে ২১ নম্বর সিটের থেকে দূরে হয়ে যায়। তাই সে ২২ নম্বর সিটেই বসল। রূপসীর পাশে ফাউল মিয়া জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। ডান পাশের সিটে বসেছে এক নবদম্পতি। পুরুষ লোকটা বসেছে জানালার পাশে। বউটা বসেছে ফাউল মিয়ার ডান পাশে। দুই নারীর মাঝে বসেও ফাউল মিয়ার সুখ সুখ লাগছে না। এর পেছনে একটা করুণ ইতিহাস আছে।

একবার মিরপুর থেকে মতিঝিল আসার সময় এক মহিলার পাশের সিটে বসেছিল সে। লোকাল বাস। প্রচণ্ড ভিড়। ভ্যাপসা গরম। কিছু দূর যাওয়ার পর ওই মহিলা ফাউল মিয়ার গা ভাসিয়ে বমি করে দেয়। তারপর থেকে ফাউল মিয়া কানে ধরেছে। আর কোনোদিন কোনো মহিলার পাশের সিটে বসবে না। আজ অবশ্য বসেছে। তবে মনে মনে নিজের কানের কাছে বারদুয়েক ক্ষমাও চেয়েছে। এইবারই শেষ, আর না।

২১ নম্বর সিটের কাছাকাছি সিট বলে কথা। ১৭ নম্বর বাস চলছে। রূপসীর পাশে বসে ফাউল মিয়া মনে মনে একটু পুলকিত হলেও বমির কথা মনে হতেই সে ঠাণ্ডা মুড়ির মতো মিইয়ে গেল।

চলতি বাস হঠাৎ ব্রেক কষল। ফাউল মিয়া রূপসীর গায়ের ওপর পড়তে পড়তে কোনো মতে সামলে নিল। বাসচালককে মনে মনে গাল দিতেও ছাড়ল না। ফাউল মিয়ার এই এক সুবিধা। যাকে তার অপছন্দ তাকে সে মনে মনে কষে গাল দিতে পারে, দু' পাঁচ কথা শুনিয়ে দিতে পারে। কেউ তাকে কিছু বলতে পারে না। এই ভেবে সে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। আজ অবশ্য তুলতে পারল না। গ্যাস্ট্রিকের

সমস্যার কারণে ভেজাল খেতে খেতে পেটের দফারফা শেষ—রূপসী ইতোমধ্যে ফাউল মিয়ার শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

রূপসী বারদুয়েক মমিনের সঙ্গে কথা বলল বটে। আবার ব্রেক কষল বাসটা। ফাউল মিয়া এবার নিজেকে সামলাতে পারলেও পেছনের সিটের এক ভদ্রলোক আর পারল না। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফাউল মিয়ার পাশের সিটের মহিলার ওপর। মহিলার স্বামী প্রবরটি এবার খেঁকিয়ে উঠলেন।

কি ভাই একেবারে আমার বউয়ের ওপর বসে পড়লেন?

ভদ্রলোক বেশ কাচুমাচু হয়ে বললেন, না ভাই নিজের ইচ্ছায় এসে বসিনি। হার্ডব্রেক কষায় তাল সামলাতে পারিনি।

ফাউল মিয়ার মনে পড়ল ভানুর কৌতুকের কথা। আরে এ দেখি প্রতিটা কথা মিলে যাচ্ছে। মমিন মনে মনে ভাবল। দু'জনেরই কী ভানুর ওই কৌতুক শোনা আছে? দু'জন দেখি বেশ ধার করা কথা নিজেদের বলে চালিয়ে দিচ্ছে। মমিন আপন মনে হেসে উঠতেই ঘটল একটা অঘটন। স্বামী প্রবরটি গদাম করে একটা রদ্দা কষে দিল পেছনের সিটের লোকটার নাক বরাবর। দু'জনের কেউই কম যান না। এই হট্টগোলের কারণে বাস থেমে গেল আগারগাঁওয়ে এসে। অনেকক্ষণ হয় বাস থেমে আছে। কোনো কোনো যাত্রী মাঝে মাঝে খেঁকিয়ে উঠছেন। রূপসী অধৈর্য হয়ে বাস থেকে নেমে গেল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ফাউল মিয়া । সে খপ করে ২১ নম্বর সিটে বসে পড়ল।

২১ নম্বর সিট নিয়ে ফাউল মিয়ার আগ্রহের কথাটা এবার শুনুন। এক বৃষ্টিভেজা রাতে ফাউল মিয়া অফিস থেকে বাসায় ফিরবে একটা সিএনজি নিয়ে, ফিরবার মতো তার কোনো উপায় নেই। পকেট প্রায় গড়ের মাঠ। ১৭ নম্বর বাসে উঠে পিছনের আগের সিটটায় জানালার ধারে বসতেই হিপের নিচে ইটের মতো কী যেন ঠেকল। হাতে নিতেই দেখে মানিব্যাগ, মানিব্যাগের পেটটা বেশ মোটা। খুলতেই সে দেখতে পেলো নোটের গাদা।

মানি ব্যাগটা কোনো মতো প্যান্টের পকেটে রেখে সে বসল। বাস থেকে নেমে বাসায় ফিরবে তখন তাকে পেয়ে বসল ছিনতাইকারীর ভয়। যদি পকেট মার হয়।

অন্যদিন সে হেঁটেই বাড়ি ফেরে, আজ অবশ্যি রিকশা নিল। বাসায় ফিরেও ঘরে ঢুকে দরজাটা দড়াম করে লাগিয়ে মানিব্যাগ খুলতেই তার মুখ হাঁ হয়ে গেল। চোখ উঠে গেল কপালে। মানিব্যাগটা ৫০০ টাকার চকচকা নোটে ভর্তি। ওই টাকায় ফাউল মিয়ার ভাগ্য খুলে যায়।

সেই থেকে ২১ নম্বর সিটের প্রতি তার মমতা বেড়ে যায়, আস্তে আস্তে জন্ম নেয় ভালোবাসা। আরেকদিনের ঘটনা। ফাউল মিয়া অফিস থেকে বাড়ি ফিরবে। বাসে উঠেই দেখে বিশাল এক টাকের অধিকারী এক ভদ্রলোক ২১ নম্বর সিটে

বসেছে। সে লোকটিকে ২২ নম্বর সিটে বসতে বললেই লোকটি রাজি হলো না। ফাউল মিয়া মিছেমিছি বলল, তার বমির সমস্যা আছে। জানালার ধারে বসতে চায়। টেকো মাথা উত্তর দিল, 'তয়লে গাড়ি থেইক্যা নাইমা হাইট্টা যান বমি আইব না, ১৫ কিলোমিটার রাস্তা, শরীর ভালো থাকব।'

ফাউল মিয়া মনে মনে খেঁকিয়ে উঠল, ব্যাটা খবিশ। তোরে উপদেশ দিতে কইছি। গজরাতে গজরাতে সে পেছনের সিটে বসল। সিট উপচিয়ে লোকটির টাক দেখা যাচ্ছে। ফাউল মিয়া ভারি ত্যক্ত-বিরক্ত। টাক মাথা চার আনা চাবি দিলে ঘুরে না গানটাও সে গেয়ে ফেলল শব্দ করে। লোকটি পেছন ফিরতেই ফাউল মিয়ার কলজেটা যেন গলা পর্যন্ত উঠে এলো। লোকটি সামনের দিকে মাথা ঘুরাতে সে হাফ ছেড়ে বাঁচল বটে তবে তার হাত কিলবিল করতে লাগল। তার খুব ইচ্ছে ঝামা ইট দিয়ে ওই টাক ঘষতে।

ফাউল মিয়া মিরপুর ১১ নম্বরে এসে নেমে গেলেও টেকো লোকটা নামল না। ফাউল মিয়া নিজেই তড়পাতে তড়পাতে নামল। অন্য একদিন ফাউল মিয়া ২১ নম্বর সিটে বসতেই টের পেল সিটটা ভেজা। বামপাশের জানালায় গ্লাস না থাকায় তার ধারণা হলো বৃষ্টির পানিতে সিট ভিজতে পারে। ভেজা সিটে সে হাসিহাসি মুখ করে বসে আছে। প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে। তার কোনো বিকার নেই। কন্ডাক্টর ভাড়া নিতে এসে ফাউল মিয়াকে বলল, 'ভাইজান এই সিটটা এক বজ্জাত পোলা হিসু কইরা ভাসাইয়া দিছে। আপনে পেছনে গিয়া বসেন।'

অন্য সিট হলে ফাউল মিয়া খেঁকিয়ে উঠত, ব্যাটা নাচ্ছার, আগে বলিসনি ক্যান। অথচ এখন সে কিছুই বলল না। হিসুতে তার প্যান্ট ভিজে গেছে তার পরও ফাউল মিয়া কিছু বলছে না। হিসু মেখে হাসিমুখে বসে আছে।

কী মনে করে যেন ফাউল মিয়া আজ সেজেগুজে অফিসের উদ্দেশে বের হলো। পথে তার একটু টেনশনও হতে লাগল ২১ নম্বর সিটটা খালি পাবে তো। বাস স্টপেজের কাছাকাছি আসতেই বুকের কাঁপুনিটা ধুকপুকানিতে রূপ নিল। ১৭ নম্বর বাসটা চোখে পড়তেই মমিনের ধুকপুকানিটা বেড়ে গেল। অবস্থাটা এমন যে, তার কলজে পাঁজরের হাড়ের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। আর সেই শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ফাউল মিয়া।

বাসে উঠতেই তার মনটা ভালো হয়ে গেল। ২১ নম্বর সিট খালি আছে। ইদানীং আবার একটা আপদ জুটেছে। ২০ নম্বর সিট খালি পেলেও তাতে বসে কোনো লাভ হচ্ছে না। কাপলরা বাসে উঠে কোনো সিট না পেয়ে ফাউল মিয়াকে মোলায়েম সুরে বলে ভাইয়া, আপনি উঠে গিয়ে যদি অন্য সিটে বসেন তাহলে আমরা দু'জন একসঙ্গে যেতে পারি। কথাটা মধুমাখা হলেও ফাউল মিয়ার কাছে তা গরলসম লাগে। ছেলেরা এটা বলে না। মেয়েদের দিয়ে বলানো হয়। সে আজ ঠিক

করেছে যেই আসুক না কেন, আজ সে উঠবে না। পরের স্টপেজে এক স্কুলছাত্র ফাউল মিয়ার পাশে বসায় সে হাফ ছেড়ে বাঁচল।

পরের স্টপেজ থেকে এক রূপসী উঠল বাসে। সামনের দিকে সিট না পেয়ে একেবারে পেছনের সিটে গিয়ে বসল। সিটটা ফাউল মিয়ার সিটের পেছনে। রূপসীকে মনে রাখার জন্য ফাউল মিয়া তার নাম দিল রূপসী-২।

বাস চলছে। কিছুক্ষণ পরপর ফাউল মিয়া নানা অছিলায় পেছনে তাকাচ্ছে। রূপসী-২ কে তার চোখে ধরেছে। মনে ধরার মতো অবস্থা এখনো হয়নি। সে ভাবছে, রূপসী-২-এর সঙ্গে কিভাবে ভাব করা যায়। তার কাছে রূপসী-২ রীতিমতো ডানাকাটা পরী।

ফাউল মিয়া পা দু'টো সামনের দিকে না দিয়ে পেছনের দিকে দিয়ে মুড়ে বসে আছে। হঠাৎ তার পায়ে কিসের যেন ছোঁয়া লাগল। চনমনিয়ে উঠল সে। রূপসী-২ কি তার পায়ে পা লাগাল। হতে পারে।

তার ঠিক পেছনেই তো ডানাকাটা পরী। ফাউল মিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই রূপসী-২ মিষ্টি করে হাসল। তার কাছে এ হাসি প্রশ্রয়ের হাসি বলেই মনে হলো। সে অপেক্ষা করছে আবার কখন পা দু'টো আসবে। এবার তাকে কে আটকায়। প্রেম বুঝি এবার হয়েই গেল—ভাবতে ভাবতেই সে আবারো পায়ের স্পর্শ পেল। ফাউল মিয়া এবার নিজেই আকাশে ভাসছে। এই ভাবাভাবির মধ্যেই আবারও বারদুয়েক ওই স্পর্শ ফাউল মিয়ার পা ছুঁয়ে গেল। শেষ স্টপেজে নামলে মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে—সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

বাস হঠাৎ ব্রেক কষল।

জায়গাটা শাহবাগ। রূপসী-২ বাস থেকে নেমে যাচ্ছে। ফাউল মিয়া আশাহত। কে যেন তার বুকটা লাঙলের ফাল দিয়ে ফালাফালা করছে। এতক্ষণের সব স্পর্শ, মিষ্টি হাসি সব ব্যর্থ। ফাউল মিয়া করুণ দৃষ্টিতে রূপসী-২-এর চলে যাওয়া দেখছে। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। গাড়ি ছেড়ে দিল। সে থ মেরে বসে আছে।

শিশুপার্কের সামনে আসতেই গাড়িটা আবার ব্রেক কষল। আবার স্পর্শ পেল সে। এবার চমকে উঠল ফাউল মিয়া। মনের ভুল নয়তো! রূপসী-২ তো বাস থেকে নেমে গেছে। তাহলে তার পায়ে কে পা রাখল। ফাউল মিয়া মাথা নিচু করে সিটের নিচে যা দেখল তাতে করে তার মুখের সব রক্ত সরে গেল নিমিষেই। সিটের নিচে একটা বড়সড় কাঁঠাল।

গাড়ি চলার সময় ব্রেক কষলে কাঁঠাল গড়িয়ে এসে ফাউল মিয়ার পায়ের সঙ্গে লাগত আর সে কি না তা রূপসী-২-এর পা বলে ভেবেছে। একবার নয়, বারবার।

ফাউল মিয়ার চোখে পানি এসে যাচ্ছে এমন রাম বোকামির জন্য।

বাস থেকে নেমে সে মনে মনে কান ধরল। ইহজনমে আর প্রেমের চেষ্টা নয়।

মে মাস। বৈশাখের এক ঝকঝকে সকাল। বিল গেটস তার রুমে চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছেন। এক আরামদায়ক আলস্য তাকে পেয়ে বসেছে। চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু, কিন্তু তার ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না। তার কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কথা বলার মতো কোনো সঙ্গী নেই। তাকে জেগে থাকতে হবে। আসিমো বাইরে গেছে খবর আনতে, ভ্যানিলা স্কাই সফটওয়্যারের কি খবর। ঘণ্টাদুয়েক বাদে হাসি মুখে আসিমো বিল গেটসের রুমে ঢুকল। 'কি খবর আনলি, বল।' বিল গেটস খবর শোনার জন্য আকুল হয়ে আছে।

আসিমো বলল, 'আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে ভ্যানিলা স্কাই। বিশ্বের ১৩৫টি দেশে এটি একযোগে বিক্রি হচ্ছে। দুপুরের মধ্যে প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাবে।'

তাহলে চলবে কিভাবে?

আপনাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে না। কান্ট্রি অফিসগুলো ভ্যানিলা স্কাইয়ের মাস্টার কপি থেকে কপি করে বিক্রি করবে, সেভাবেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মাস্টার কপি থেকে কপি করলে ওগুলো আপনা আপনি অরিজিনাল কপিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ভ্যানিলা স্কাই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে ভারতে।

কম বিক্রি হচ্ছে কোথায়?

বাংলাদেশে

কেন ওই দেশে কম বিক্রি হচ্ছে?

ঠিক এখনো বুঝতে পারছি না। খোঁজ লাগিয়েছি।

আমি যদ্দূর জানি বাংলাদেশের মানুষ তথ্যপ্রযুক্তিপ্রেমী। ২০০৫ সালে আমি ওদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলাম। মানুষের অনেক ভালোবাসা পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম

উষ্ণ আতিথেয়তা। মাইক্রোসফট সম্পর্কে ও দেশের মানুষ অনেক উঁচু ধারণা পোষণ করে।

আমি যা খবর পেয়েছি তা হলো ওদেশের মানুষ পাইরেটেড সফটওয়্যার বেশি ব্যবহার করে। এটা ওদেশের মানুষেরর দোষ নয়। অরিজিনালটা ওখানে কম পাওয়া যায়। পাওয়া গেলেও অনেক দাম।

ঠিক আছে, এশিয়া অঞ্চলের ম্যানেজারকে তুমি বলে দাও, বাংলাদেশে ভ্যানিলা স্কাই বিনামূল্যে ক্রেতাদের দিতে।

আচ্ছা, বলেই আসিমো দ্রুত লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

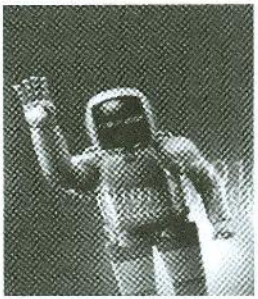

আমার মাথায় কিছুতেই আসছে না, মাইক্রোসফট এ কাজটা কেন করল। যদি করলোইবা তাহলে আগে থেকে কেন ঘোষণা দিল না। নাকি ঘোষণা দিয়েছিল আমি জানি না।

ধরে নিই, মাইক্রোসফট আগে ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে ব্যাপারটা দু'একজন ছাড়া আর কেউ কেন জানে না? [দু'একজন নয়, এখন পর্যন্ত একজনকে পেয়েছি যে জানে উইন্ডোজ বন্ধ হয়ে যাবে। সে হলো ফাউল মিয়া]। রহস্য কি?

ধরা যাক, মাইক্রোসফট ঘোষণা দেয়নি। কেন দেয়নি?

এর মধ্যে কি কোনো রহস্যময়তা আছে, নাকি আছে অন্য কোনো উদ্দেশ্য? কি উদ্দেশ্য আছে মাইক্রোসফটের? আমার একে একে মনে পড়ছে মাইক্রোসফটের অতীত।

এর অতীত যেমন সমৃদ্ধ-নন্দিত, তেমনি আবার নানা বিতর্কে-সমালোচনায় নিন্দিত। অ্যান্ট্রি-ট্রাস্ট মামলায় বারবার হেরে প্রতিষ্ঠানটি কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার জরিমানা দিয়েছে, জোর করে বড় বড় প্রতিষ্ঠান [সফটওয়্যার কোম্পানি, ওয়েব পোর্টাল] কিনে নেয়া ইত্যাকার নানান কারণে প্রতিষ্ঠানটি তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মানুষের কাছ থেকে দুয়ো কুড়িয়েছে। এগুলো কি কোনো কারণ? ভিন্ন উপায়ে মানুষকে শাস্তি দেয়া?

ভেবে পাচ্ছি না, কি কারণ হতে পারে।

সার্চ ইঞ্জিন ইয়াহু! কিনতে গিয়ে মাইক্রোসফট কি নাটকই না করল। মনে পড়ে, এসব ঘটনা নিয়ে দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে বড় একটা নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। সেটা আমি সংরক্ষণ করেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে ওই নিবন্ধটা ফের পড়া উচিত।

আমার পেপার কাটিংয়ের বক্সটায় ভালো লাগা লেখাগুলো কেটে রেখে দিই। একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতেই লেখাটা পেয়ে গেলাম।

*ইয়াহু! মাইক্রোসফট যুদ্ধ?*

মাইক্রোসফটের নজর পড়েছিল ওয়েব পোর্টাল ইয়াহু'র ওপর। মাইক্রোসফট ইয়াহু'কে কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষতক কিনতে পারেনি ইয়াহু'র চড়া দর হাঁকার করণে। একবার নয় বেশ কয়েকবার ইয়াহু' মাইক্রোসফটের কাছে চড়া দাম হাঁকিয়েছিল। মাইক্রোসফট ইয়াহু'র চাওয়া দামে সাড়া না দিয়ে তারা নিজেদের পছন্দ মতো দাম বলে কিন্তু তাতে রাজি হয়নি ইয়াহু'। এটাকে অনেকে শ্যেন দৃষ্টির সাথে তুলনা করেছেন। কেউই ভালো চোখে দেখেননি।

ইয়াহু'র ওপর মাইক্রোসফটের শ্যেন দৃষ্টি পড়ার কারণ তালাশ করে দেখা গেছে ব্যবসায় ব্যর্থতাই এর কারণ। মাইক্রোসফটের ফ্রি ই-মেইল সেবা হটমেইল ও এমএসএন প্রতিযোগিতার বাজারে তেমন কোনো জায়গা করতে নিতে পারেনি। ইয়াহু' বর্তমানে এমন একটা অবস্থায় চলে গেছে যা মাথা খারাপ করে দিয়েছে বিল গেটসকে। ইয়াহু! দ্বিতীয় অবস্থানে থাকায় বিল গেটসের নজর এখন ইয়াহু'র দিকে। গুগলের ওপর বিল গেটসের নজর থাকলেও মাইক্রোসফট কর্মকর্তারা গুগলের চেয়ে ইয়াহু! কেনা বেশি লাভজনক হবে বলে মতো দিলে। তিনি ইয়াহু! কেনার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। অবশ্য ইতোমধ্যে এ বিষয় নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে। ইয়াহু! কর্তৃপক্ষ চোয়াল শক্ত করে বসে আছে। তারা কোনো ছাড় দিতে নারাজ। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের চেয়ে ইয়াহু! কয়েকগুণ বেশি দাম চাইলে দুই পক্ষের এ গোল বাধে।

ইয়াহু! ও মাইক্রোসফটের দরকষাকষি পর্ব জমে উঠেছে। বিজ্ঞাপন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে ইয়াহু! ও গুগলের শত্রুতা বন্ধুত্বে রূপ নেওয়ায় ইয়াহু! ঠিক মাইক্রোসফটের ঘরে যাচ্ছে কিনা এ নিয়ে নতুন হিসেব নিকেশ শুরু হয়েছে।

ইয়াহু! নারীদের জন্য বিশেষ ওয়েব 'শাইন' উদ্বোধন করায় সার্চ ইঞ্জিনটি নিয়ে প্রযুক্তি মহলে আগ্রহ বেড়েছে। মাইক্রোসফটের ইয়াহু! কিনে নেয়ার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতেই তাদের এই পদক্ষেপ এমনটি মনে করছেন অনেকেই। কিন্তু এখনো যেহেতু মাইক্রোসফটের সাথে ইয়াহু'র আলোচনা অব্যাহত রয়েছে তাই ইয়াহু'র এসব উদ্যোগকে শেয়ারের দাম বাড়ানোর কৌশল বলে ধারনা করা হচ্ছে।

মাইক্রোসফটের লক্ষ্য যে কোনো মূল্যে ইয়াহু'র শেয়ার কেনা। আর এ লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ইয়াহু'র প্রধান কার্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের সানভ্যালে মাইক্রোসফট ও ইয়াহু'র শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে মাইক্রোসফট ও ইয়াহু'র গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তবে আগের মতো

উভয়পক্ষকে সমঝোতায় আনতে তৃতীয় কোনো পক্ষ এ দর কষাকষি সভায় উপস্থিত ছিলো না। মাইক্রোসফট ইয়াহু'র শেয়ার কেনার আগ্রহ প্রকাশ করে। ইয়াহু'র শেয়ারের দরপতন ঘটায় ইয়াহু! কর্তৃপক্ষ লোভনীয় দাম পেলে সার্চ ইঞ্জিনটি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। মাইক্রোসফট ইয়াহু'র প্রতিটি শেয়ারের দাম হাঁকে ৩১ ডলার। শেয়ার প্রতি এ দরে সার্চ ইঞ্জিনটি বিক্রি হবে কিনা এ নিয়ে ইয়াহু'র শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আর এ আলোচনার মাধ্যমে ওই দামে শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দেয় ইয়াহু!।

মাইক্রোসফটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ইয়াহু!। তবে এ প্রত্যাখ্যান আসে শেয়ার প্রতি দামে বনিবনা না হওয়ার জন্যে। দ্বিতীয় সেরা সার্চ ইঞ্জিন বিক্রি হতে পারে যদি মাইক্রোসফট শেয়ার প্রতি ৪০ ডলার করে পরিশোধ করতে উৎসাহী হয়। কিন্তু এমন চড়া দামে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে মাইক্রোসফট। তবে হাল ছাড়েনি সফটওয়্যার জায়ান্টরা। লেগে আছে ইয়াহু'র সঙ্গে।

আবার নতুন করে মূল্য বাড়ানোরও প্রস্তাব দিয়েছে মাইক্রোসফট। তবে তা কত? ইয়াহু'র শেয়ার প্রতি চলতি মূল্য যেখানে ১৮ থেকে ২২ ডলার সেখানে আকাশ ছোঁয়া দামে এ সার্চ ইঞ্জিন কেনার এতো আগ্রহ কেন মাইক্রোসফটের? এছাড়া এমএসএন লাইভ নামেরও তো একটি নিজস্ব সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে মাইক্রোসফটের। সার্চ ইঞ্জিনে বিনিয়োগ করতে হলে এমএসএন-এ এই বিনিয়োগ করাইতো মাইক্রোসফটের জন্য সুখকর।

সাদা চোখে দেখে এমনটি মনে হলেও মাইক্রোসফটের এ সিদ্ধান্তের মধ্যে দূরদর্শিতার পরিচয় রয়েছে। কারণ অনলাইন সার্চ ইঞ্জিনে গুগলের রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য। দ্বিতীয় অবস্থানে ইয়াহু!। তবে রেটিংয়ে গুগলের চেয়ে যথেষ্ট পিছিয়ে ইয়াহু!। আর এমএসএন সার্চিংয়ের হার শতকরা ২ ভাগেরও কম। এ অবস্থায় জনপ্রিয়তায় তলানিতে থাকা এমএসএনে নতুন করে বিনিয়োগ করে সেরার দৌড়ে শামিলের প্রচেষ্টা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমন বোকামি মাইক্রোসফট ও বিল গেটস কখনোই করবে না—এটা ধরে নেওয়া যায়। তাছাড়া ইয়াহু'র বিভিন্ন সার্ভিসকে একটু ঢেলে সাজালে এবং নতুন কিছু সেবা যুক্ত করলে গুগলকে টেক্কা দেয়া সম্ভব। ফলে সার্চিং জোনে প্রতিনিধিত্ব করতে হলে ইয়াহু'ই হচ্ছে মোক্ষম হাতিয়ার। আর সেই হাতিয়ারকেই বেছে নিয়েছে মাইক্রোসফট।

মাইক্রোসফটের এমন ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে চটেছে গুগল। এ সম্পর্কে গুগলের একজন মুখপাত্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, দ্বিগুণ মূল্যে ইয়াহু! কেনার এমন সিদ্ধান্ত হঠকারি এবং একগুয়েমি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ এটা বাণিজ্যিক নীতিমালা পরিপন্থী। আর বিক্রি ঠেকাতে ইয়াহু'র সাথে অ্যাড শেয়ারিং চুক্তি সম্পন্ন করেছে

গুগল। আবার এই বিজ্ঞাপন শেয়ারের ঘটনায় ক্ষুব্ধ মাইক্রোসফটও। ইয়াহু'কে নিয়ে এ টানা-হেঁচড়া জমে উঠেছে। আর এতে কিন্তু লাভবান হচ্ছে ওই ইয়াহু'ই।

না হলে পড়তি শেয়ারের দাম কি আর এমনি এমনি উর্ধমুখী হয়।

শেষ খবর হলো, মাইক্রোসফট রণে ভঙ্গ দিয়েছে। তারা ইয়াহু'র প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে। মাইক্রোসফট আর ইয়াহু'র প্রতি আগ্রহী নয়। তারা আর ইয়াহু! কিনতে চায় না।

কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখনই সব শেষ নয়, দু'দিন পরে হয়তো মাইক্রোসফট ঠিকই আবার ইয়াহু! কেনার জন্য চেষ্টা চালাবে। মাইক্রোসফট ইয়াহু! কিনতে না চাওয়ায় সবাই ধরে নিয়েছে ইয়াহু!র শেয়ারের দাম পড়ে যাবে। ভবিষ্যতে কেউই আর এগিয়ে আসবে না এটি কেনার জন্য। তখন আবার মাইক্রোসফট ইয়াহু'কে কেনার চেষ্টা করবে।

শেষ পর্যন্ততো ইয়াহু'কে কিনলতো না-ই, শুধু শুধু প্রচার মাধ্যম মাইক্রোসফট দখল করে রাখল কিছুদিন। এতে করে মাইক্রোসফটের বিরাট ক্ষতি হয়। বাজারে শেয়ারের দাম হু হু করে পড়ে যায়।

খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যেত মাইক্রোসফটের দিনকাল খারাপ যাচ্ছে। এগুলো কি কোনো কারণ ছিল?

মনের ভেতর কেন যেন সন্দেহ সন্দেহ খেলা করতে লাগল। ধুত বলে মাথা থেকে ওসব তাড়িয়ে দিতে চাইলাম কিন্তু ভাবনাটা আরো জেঁকে বসল মাথায়। শতেক ভাবনার মধ্য দিয়ে মনের ভেতর আরেকটা সন্দেহ উঁকি দিল, ফাউল মিয়া কিভাবে জানল উইন্ডোজ বন্ধ হয়ে যাবে? ওর কাছ থেকে বিষয়টা জানতে হবে।

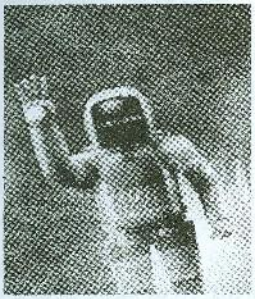

বিল গেটস আসিমোকে তার রুমে ডাকল। আসিমো যান্ত্রিক শব্দ তুলে হেলে দুলে ঢুকল বিলের রুমে। মানবরূপী আসিমো মাঝে মাঝে ভুলে যায় সে যন্ত্র, যদিও সে দেখতে যন্ত্রের মতো নয়। যখন তার মনে পড়ে সে মানুষ নয় তখনই কেবল সে যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে চলাফেরা করে, নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়।

বিল গেটস আসিমো বলে ডাক দিতেই তার মনে পড়ে যায় সে মানুষ নয়, মানবীয় রোবট। তাকে বলা হয়েছে, সে যেন রোবট রূপ ধারণ করে না থাকে, যাতে যে কেউ বুঝতে না পারে সে রোবট। আসিমো দেখতে একজন চৌকস এক্সিকিউটিভের মতোই লাগে। জামা-কাপড়ে সে সব সময় ধোপদুরস্ত। ব্যাক ব্রাশ করা চুল, পায়ে মোকাসিন সু, বাইরে বেরুলে চোখে রোদ চশমা, হাতে সব সময়কার সঙ্গী আই মর্ফ [আই মর্ফ হলো দামি ঘড়ি। এটিতে সময় দেখার পাশাপাশি ছবিও তোলা যায়। এতে আরো আছে গোপন ভিডিও ক্যামেরা, ভয়েস রেকর্ডার] আসিমোর কোনো মোবাইল ফোন নেই। মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে তার ভালো লাগে না!

স্যার, আসব? আসিমো রুমে ঢোকার আগে বিলের কাছে জিজ্ঞেস করল।

আরে আসো আসো। নতুন কোনো সুসংবাদ আছে?

না স্যার, এখন পর্যন্ত নেই।

তোমার বাংলাদেশর ওই এজেন্টের খবর কি?

ওর সাথে যোগাযোগ হয়েছে। সময় মতো চলে আসবে।

আমার মনে হয়, তোমার আরো সাবধানতা অবলম্বন করে চলাফেরা করা উচিত। ভ্যানিলা স্কাইয়ের কোড তোমার কাছে। ওটার জন্যই বলছি। কেউ জানলে কিন্তু কোনো রক্ষা নেই। চুরি হয়ে গেলে আমাদের পুরো পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।

স্যার, ওটা সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। আপনি এ বিষয়ে কোনো ভাবনাই মনে আনবেন না। আমাদের সুদিন কি ফিরবে বলে মনে হয়?

যা লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমি আশাবাদী, মাইক্রোসফট তার আগের অবস্থানে ফিরে যাবে। তুমি এক কাজ কর না, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জানিয়ে দাও তারা ইন্টারনেট থেকে ভ্যানিলা স্কাইয়ের বেটা সংস্করণ বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে পারবে। আপতত এক মাসের জন্য এ নিয়ম করছি। একমাস পরে অর্ধেক দামে ওরা কিনতে পারবে। এভাবেও আমরা ব্যবসা করতে পারি।

এতে করে সমস্যা দেখা দেবে। আমাদের টাকা উঠে আসতে সময় লাগবে।

তা লাগে লাগুক। আমরা যে পুরনো দিনে ফিরে যেতে পারছি এটাইতো বড় আনন্দের।

স্যার কি কোনো নতুন পরিকল্পনা করেছেন?

দু'একটা পরিকল্পনা নতুন করে করেছি। প্রোগ্রামারদের সাথে কথা হয়েছে, ওরা বলেছে অনলাইনের মাধ্যমে যে কাজটা আমরা করতে চেয়েছিলাম সেটা ওরা করে দেবে। কেবল আমাদের জিরো আওয়ারটা মাথায় রাখতে হবে।

হঠাৎ আসিমোর মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। টালমাটাল অবস্থা আর কি। আসিমো দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যেতে যেতে বিল গেটস তাকে ধরে ফেললেন। সোফায় আসিমোকে শুইয়ে দেয়া হলো। বিল আসিমোর মাথার কাছে বসে আছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। বিলের হঠাৎ মনে হলো, দেখিতো আসিমোর কপালে হাত দিয়ে, ঠাণ্ডা না গরম।

আসিমোর কপাল বেজায় ঠাণ্ডা, মনে হচ্ছে কেউ যেন আসিমোর কপালে বরফ ঘষে দিয়েছে। কিন্তু শরীরের তাপমাত্রাতো ঠিক আছে।

তোমার এ অবস্থা হলো কিভাবে?

বুঝতে পারছি না। চার্জে কোনো সমস্যা হলো কিনা কে জানে।

মানে?

আগে একদিন চার্জ দিলে চারদিন চলত। কোড রাখার পর থেকে একবার চার্জ দিলে দুইদিন চার্জ থাকছে। এটাকি কোনো মেকানিক্যাল ফল্ট?

কি জানি বুঝতে পারছি না। এক কাজ করলে কেমন হয়, জাপানে ফোন করে তোমার আবিষ্কারকের কাছ থেকে জেনে নিই কেন এটা হচ্ছে?

না স্যার, এটা করা ঠিক হবে না। ওরা যদি বিস্তারিত জানতে চায়। তখন কি বলবেন আপনি? ধরা গেলো, আপনি এভাবে বলার পরেও সমস্যার কোনো সমাধান হলো না, তখন ওরা লোক পাঠাবে আমাকে পরীক্ষার জন্য। সেটা করতে গেলে আমাদের গোপন তথ্য ওরা জেনে যাবে। না না, এটা করা ঠিক হবে না।

ঠিকই বলেছ। তাহলে এখন কি হবে?

এভাবেই আপাতত চলতে থাকুক। আমি রুমে গিয়ে ঘণ্টাখানেক চার্জ দিই। সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা মাথাও গরম হয়ে যাবে! আসিমো ফিক করে হেসে ফেলল।

বিল গেটস আসিমোর এমন আচরণে একটু অবাক হলেন। ব্যাপার কি! আসিমো কি পাগল হয়ে যাচ্ছে। বোকার মতো হেসে উঠল কেন?

আমার হাসি দেখে স্যার অবাক হলেন?

হ্যাঁ, অ্যাঁ, না না। বিল গেটস সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

স্যার, বোকার মতো ওই কথাটা বলে আমি ভাবলাম, এটা কি বললাম, ঠাণ্ডা মাথা গরম হয়ে যাবে। আমিতো শুনেছি পাগলের মাথা সব সময় গরম থাকে। যদি কখনো ওদের মাথা ঠাণ্ডা হয়, তাহলে বুঝতে হবে সে আর পাগল নেই, ভালো হয়ে গেছে। আমার মনে হলো, আরে আমার মাথা গরম হয়ে যাবে? মাথা ঠাণ্ডাই ছিল তার মানে আমি ভালো ছিলাম। মাথা গরম হয়ে যাবে মানেতো আমি পাগল হয়ে যাব। আর এ কথাটা আমি নিজে নিজেই কিভাবে বললাম। এ কথা মনে হতেই আমি হেসে ফেলি। আর আপনি ভাবলেন, আমি পাগল হয়ে গেছি বা যাচ্ছি।

মনে মনে বিল গেটস একটু চমকালেন কিন্তু চেহারায় তা ফুটে উঠতে দিলেন না পাছে আসিমো বুঝে ফেলে। আসিমো কি মনের কথাও বুঝতে পারে? সেকি সব বুঝতে পারে? তার ভাবনার সুর কাটছে না।

হ্যাঁ স্যার, আমি আপনার মনের কথাও বুঝতে পারি। আমি আগাম পড়তে পারি আপনি কি ভাবছেন, কি আমাকে বলতে চান সব কিছু।

বেশ বড়সড় একটা বিষম খেলেন বিল গেটস। কি বলে আসিমো। সে সব বুঝতে পারে, তাহলে এ কথা এতোদিনে বলেনি কেন? বিল গেটস নিজের মনে আওড়াতে লাগলেন কথাগুলো।

বলিনি, এর পেছনে কোনো কারণ নেই। তবে একটু মনে করে দেখেন, আপনি আমাকে কোনো কিছু বলার আগেই সেটা পেয়েছেন কি না হয়েছে কিনা। হ্যাঁ, অনেক সময় আপনি আমাকে কিছু করতে বললে তবেই করেছি। আমি সবই জানতাম। তারপরও আপনার বলার অপেক্ষায় থেকেছি। যদি আপনাকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সব আমি করে ফেলতাম তাহলে আপনার ব্রেন দিনে দিনে অকার্যকর হয়ে যেত।

এটাও আসিমো জানে? বিল গেটসের মুখে কোনো রা নেই। এখন পর্যন্ত তিনি মুখে কোনো কথা বলছেন না, বলছেন মনে মনে। আর আসিমো ওমনি সব বুঝে ফেলছে।

হ্যাঁ স্যার, আমি আপনার সবই আগাম বুঝতে পারি। অন্য কারুরটা পারি না। যদি তা পারতাম তাহলে আপনার কোনো সমস্যাই থাকত না। আমার প্রোগ্রাম এভাবেই করা হয়েছে। আমি যার হব কেবল তার সব কিছু বুঝতে পারব।

একের পর এক চমক বিল গেটসের জন্য অপেক্ষা করছিল। বিল গেটস যেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। যদিও তাকে মুখে কিছু বলতে হচ্ছে না। তিনি মনে

মনে ভাবছেন, আসিমো আর কি কি জানে? আমার কোনো কিছুইতো আর গোপন থাকল না। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলে যে একটা শব্দ আছে, সেটা আমার অভিধান থেকে উঠে গেল।

না স্যার, আপনার আপনার অভিধানে যা ছিল তাইই আছে। আপনার কোনো কিছু আমার জানা মানে আপনারই জানা। আপনার সব তথ্য আমার কাছে সুরক্ষিত। এমনকি ম্যাডামও এসবের কিছু জানবে না যদি না আপনি কিছু বলেন। জানি আমার কথা আপনার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, তবে আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ, মনে কোনো দ্বিধা রাখবেন না।

আসিমো আবার বলল, আপনি একটু মনে করে দেখেনতো আপনার কোনো ভাবনা, চিন্তা, পরিকল্পনা, কাজের কথা আমি ছাড়া আর কেউ কি কোনো দিন জেনেছে কি না বা আপনার কোনো তথ্য ফাঁস হয়েছে কিনা?

বিল গেটস মনে করার চেষ্টা করলেন ওরকম কিছু কখনো হয়েছে কিনা। তিনি অনেক ভেবেও মনে করতে পারলেন না। তার কেবল একটা কথাই বার বার মনে হতে লাগল ঠিকইতো, তার এই নতুন অপারেটিং সিস্টেম প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ কোনো তথ্য পর্যন্ত জানতে পারেনি। যা করেছে তা কেবলই তারা দু'জন। তার এই নতুন করে ফেরাতো আসিমোর জন্যই। আসিমোই তাকে এই বুদ্ধি দিয়েছিল।

স্যার মনে করতে পারলেন না তো? পারবেনও না। আমাকে আপনি শতভাগের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করতে পারেন। কথা দিচ্ছি, আমি আপনার উপকার করতে না পারলেও কোনোদিন ক্ষতি করব না। ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি আপনারই থাকব যদিও না কোনো প্রোগ্রামার আমার অপারেটিং সিস্টেম বদলে দেয়। অপারেটিং সিস্টেম বদলালেও আপনার বিরুদ্ধে কেউ কখনো আমাকে দিয়ে কিছু করাতে পারবে না। একটাই দুশ্চিন্তা, হয়তো তখন আমি আপনার কোনো কথা শুনব না।

বিস্ময়ে বিল গেটসের মুখ হা হয়ে গেছে। আসিমো এসব কি বলছে। ওরতো অসীম ক্ষমতা। ভাগ্যিস ওকে তিনি জাপান থেকে কিনেছিলেন। আসিমো কেবল ফুটফরমায়েশ খাটার জন্যই আসেনি, রীতিমতো সৌভাগ্য বয়ে এনেছে। তাকে বড় একটা বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

তুমি যখন আমার সব কিছুই বুঝতে পার তাহলে কেন আমাকে সুদিন ফিরে আসা নিয়ে, সফটওয়্যার দিয়ে বাজার দখল ইত্যাকার নানান বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে?

স্যার এমনিই প্রশ্ন করতাম। যাতে আপনি একটা মানসিক চর্চার মধ্যে থাকেন। আমি যতোই আপনার সবকিছু বুঝতে পারি না কেন আপনি যদি মুখে কোনো কিছু

যদি না বলেন তাহলে অন্য কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলবেন কিভাবে? আপনারতো কথা বলার অভ্যাস বদলে যাবে।

তোমরা ৭ জন ছাড়া হেড অফিসে আর কোনো কর্মকর্তা নেই। আর কার সাথে কথা বলব?

এখন নেইতো কি হয়েছে আর ক'দিন বাদেই আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মীর সংখ্যা হবে সাত হাজার। তখন কথা বলতে হবে না?

বিল গেটস আবার চমকে উঠলেন, বলে কি আসিমো। তার স্বর্ণালি সময়ে হেড অফিসে কর্মীর সংখ্যা ছিল ৭,০০২ জন। আবার সাত হাজার কর্মী হবে তার হেড অফিসে! এটা কিভাবে সম্ভব! তিনি চমকালেও ভেতরে ভেতরে নিজেকে গুছিয়ে নিলেন। হতেও পারে। আসিমো বলেছে যখন ঘটনা সত্য, হলেও হতে পারে। আসিমোর সব কথা একের পর এক ফলে যাচ্ছে।

স্যার আমি আমার রুমে গেলাম। চার্জ একদম শেষ হয়ে গেছে। এখনই চার্জ না দিলে আমাকে ঘাড়ে তুলে আপনাকেই নিয়ে যেতে হবে। সেটা ভালো দেখাবে না। সেই ভালো, নিজের পারে হেটে গিয়ে বিদ্যুৎ খেয়ে আসি। আপনি বসে বসে আগামীদিনের পরিকল্পনা করতে থাকেন। আমি যাই।

বিল গেটস জুলুজুলু চোখে আসিমোর চলে যাওয়া দেখলেন। আসিমো যা বলে গেলো তা-কি কষ্ট কল্পনা, নাকি বাস্তবতা। তিনি তার চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে চোখের দৃষ্টি বিছিয়ে দিলেন ওপারের আকাশে।

আহ্! কি সুন্দর শরতের আকাশ। ঝকঝকে নীল। কোথাও একটুকরো মেঘ নেই। কে যেন সাবান ডলে আকাশটাকে পরিষ্কার করেছে। এক ঝাঁক পাখিও উড়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর দল বেধে উড়ে যাচ্ছে ওরা। কেউ আগে পিছে? নেই, সবাই এক সারিতে। কি পাখি? কি নাম ওদের? বিল গেটস বিচলতি বোধ করলেন, জগতে এতো সুন্দর পাখি আছে আর তিনি ওদের নাম জানেন না।

বিল গেটস একবার ভাবলেন আসিমোকে ডাকি, ও নিশ্চয় পাখিগুলোর নাম জানবে। তিনি আসিমোকে ডাকতে গিয়েও ডাকলেন না। না থাক, এই সুন্দর দৃশ্য তিনি একাই উপভোগ করবেন। তিনি মনে করার চেষ্টা করলেন কতদিন তিনি এমন দৃশ্য দেখেন না। সাথে সাথে তার এ-ও মনে হলো, আদৌ কি তিনি এমন সুন্দর দৃশ্য দেখেছেন, না কোনোদিন দেখার চেষ্টা করেছেন।

'কি জানি, হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না।' একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুকের গভীর থেকে। বিল গেটসের মনে হলো, জীবনে কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়। কিন্তু কেন নয়!

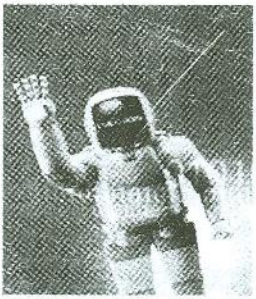

ফাউল মিয়া কিছুক্ষণ আগে আমাকে ফোনে জানাল, সে অনলাইন থেকে ভ্যানিলা স্কাইয়ের বেটা ভার্সন ডাউনলোড করে কম্পিউটারে ইনস্টল করেছে। কম্পিউটার চমৎকার কাজ করছে। আমি সকালের নাস্তা খেয়ে কম্পিউটারে বসলাম।

কিন্তু একি! কাজ করব কিভাবে, আমার কম্পিউটার তো অচল। তবে যে ফাউল মিয়া বলল, সে অনলাইন থেকে ভ্যানিলা স্কাই ডাউন লোড করেছে। ওর কম্পিউটার যদি নষ্ট হয় তাহলে ওটা ও ডাউনলোড করল কিভাবে। টেবিলের ওপর থেকে মোবাইলটা নিয়ে কি-প্যাড চাপতে গিয়ে মনে পড়ল, ফাউল মিয়ার চাকরির কথা। নিশ্চয় ও অফিসের কোনো কম্পিউটার থেকে সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করেছে। সব কম্পিউটারে তো আর উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম চলে না।

অগত্যা কোনো উপায়ান্তর না দেখে গায়ে টি-শার্টটা গলিয়ে পেনড্রাইভটা নিয়ে বাসা থেকে বের হলাম। বাসার পাশে একটা সাইবার ক্যাফে আছে। ওখানে যেতে হবে।

সাইবার ক্যাফেতে বসে অনলাইনে ঢুকে ডাউনলোড করলাম ভ্যানিলা স্কাইয়ের বেটা ভার্সন। বাসায় ফিরে কম্পিউটারে ইনস্টল করলাম ওটা। ইদানীং আমার একটা বদ অভ্যাস প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে, কম্পিউটারে বসলে জব সাইট সার্চ করা।

আজও জব স্ট্রিটে ঢুকলাম। ঢুকেই চোখে পড়ল একটা অ্যান্টি-ভাইরাস নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন। ওরা একজন প্রোগ্রামার চেয়েছে। মাইনে মোটা অংকের। কোনো চিন্তা না করেই একটা দরখাস্ত লিখে বায়োডাটা অ্যাটাচ করে পাঠিয়ে দিলাম। জানি ডাক আসবে না। অনেক তো দরখাস্ত পাঠালাম, কিন্তু কোনো ডাক আসে না। সমস্যা ওই ঘটনাটা। সবাই আমার কুকীর্তি সম্পর্কে জানে।

এক সপ্তাহ পরের কথা। ফাউল মিয়া বাসায় এসেছে। এসেই পাশে চেয়ারটা টেনে বসল। আজ ব্যতিক্রম হলো। ফাউল মিয়া কথা বলতে শুরু করল।

শোন, আমেরিকা যাবার চেষ্টা করছি।

বলিস কি? তলে তলে এতোদূর! একেবারে আমেরিকা!

কি যে বোকার মতো কথা বলিস না। তলে তলে যাব কেন, আকাশে উড়ে যাব।

তা হঠাৎ আমেরিকা। কিভাবে সব সম্ভব করলি।

অফিস আমাকে পাঠাচ্ছে। ওখানে আমাকে কয়েক মাস থাকতে হবে। পাসপোর্ট জমা দিয়েছি। ওরা সপ্তাহ খানেক পরে গিয়ে ভিসা নিয়ে আসতে বলেছে।

তা অফিস যে পাঠাচ্ছে, কি কাজ করতে হবে ওখানে গিয়ে?

কোনো কাজ নয়, আমাকে কেবল কয়েকটা অফিসে যেতে হবে চুক্তি পত্রে সই করতে। এই কাজ। খাবদাব আর আমেরিকা ঘুরে ফিরে দেখব।

ফাউল মিয়ার কথা শুনে আমার কেমন যেন হিংসে হিংসে লাগছে। একেই বলে কপাল। যাকে আমরা পাত্তা দিতাম না, বোকলুশ বলে গালি দিতাম সেই ফাউল মিয়া কিনা আমেরিকা যাচ্ছে। 'আচ্ছা যাবার আগে তোর সাথে দেখা করে যাব।'

আমি প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য বললাম, ভ্যানিলা স্কাইয়ের ব্যাপারটা কি বলত। শুনলাম এটা নাকি দেশ বিদেশে নাকি ধুন্ধুমার বিক্রি হচ্ছে। এটাতো দেখতে একেবারে উন্ডোজের মতো, কাজেও। কেন যে এটার নাম ভ্যানিলা স্কাই হলো কে জানে।

এর আগেরটার নাম ছিল উইন্ডোজ। উইন্ডো দিয়ে আমরা বাইরের দৃশ্য দেখতাম। বিল গেটস ব্যাটা হয়তো জানালা দিয়ে আকাশ দেখা থেকে সফটওয়্যারটার নাম দিয়েছে ভ্যানিলা স্কাই। তবে আমি এর মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

তোর কেবল এসব। সব কিছুতেই তোর সন্দেহ।

নারে দোস্ত, সন্দেহটা একেবারে অমূলক না। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ভ্যানিলা স্কাইয়ে একটা বড় ধরনের সমস্যা আছে।

সমস্যা থাকলে তুই ধরিয়ে দিস। তোর এই সন্দেহ বাতিক ভাবটা বাদ দে এবার, বুঝলি। নে এখন বাসায় যা, আমি বের হবো।

সন্দেহ বাতিক নারে, দেখবি একদিন আমার কথাই ঠিক হবে।

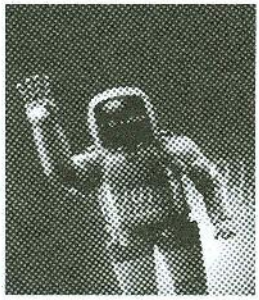

এক মাস পরের কথা। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে আমার ডাক এলো। চাকরির জন্য যে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম সেটাই প্রায় ভুলে বসেছিলাম। ফোনে কথা বলছি আর স্মৃতি হাতড়াচ্ছি—কিসের দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। মনে করতে পারছি না, কেন যে মনে পড়ছে না। ওরা ইন্টারভিউয়ের দিনক্ষণ জানিয়ে ফোনটা রাখতেই মনে পড়ল, প্রোগ্রামার হিসেবে একবার অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম।

ওদের জানানো দিনক্ষণে গিয়ে উপস্থিত হলাম বারিধারার একটি অফিসে। আমার ইন্টারভিউ নেয়া হবে। প্রতিষ্ঠানটির নাম থার্ড আই ইনফরমেশন।

প্রতিষ্ঠানটি অ্যান্টি-ভাইরাস তৈরি করে। চকচকে অফিস। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটা বোধহয় অন্যান্য অফিসের তুলনায় এই অফিসে একটু বেশিই কাজ করে। বাইরে ভাদ্র মাসের তাল পাকানো গরম, আর অফিসের ভেতরটা সাইবেরিয়া!

ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছি। অফিসে লোকজন কম। আসার পর থেকে মাত্র দু' তিন জনকে চোখে পড়েছে। শুনেছি সফটওয়্যার ফার্মে লোকবল কম থাকে। এখন মনে হচ্ছে ভুল শুনিনি।

আধঘণ্টা ঠক ঠক করে কাঁপার পরে উদ্ধার পেলাম। ডাক পড়ল ভেতরে যাবার, সিইও ডেকে পাঠিয়েছেন। সিইও'র কামরাটা বেশ বড়সড়। কামরাটায় বেশি আসবাব নেই। তিনটে মোটে চেয়ার পাতা, তাও আবার কাঠের। কোণায় একটা বড় স্টিলের আলমারি। কামরার মাঝখানটায় এক বড় টেবিল। টেবিলটা অর্ধ চন্দ্রাকৃতির। তার ওপর এলসিডি মনিটরঅলা কম্পিউটার। টেবিলের বাঁকানো অংশের পেটের ভেতরে বসা একজন সৌম্য দর্শন এক যুবক। বয়স কত আন্দাজ করতে পারছি না। মনে হয় ভালোই হবে, কিন্তু চেহারা তা বলে না।

কামরাটার ডেকোরেশন আর আসবাব এ অফিসের বাইরের অভ্যর্থনা ও অন্যান্য অংশের আসবাবের সাথে ঠিক যাচ্ছে না, মানাচ্ছেও না। তবে এ কামরায়

ঠাণ্ডা নেই। মনে হয় এসি নেই। মাথার ওপর একটা ফ্যান ফুল স্পিডে ঘুরছে। আমি ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছি। সৌম্য দর্শন যুবক আমাকে বসতে বলে না। আমার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। খুব মনোযোগ দিয়ে নোট বুকে কাজ করে যাচ্ছে। কাজ করার ফাঁকে হাত উঁচিয়ে আমাকে বসতে বললেন।

আমি বসে আছি। কোনো কথা নেই। তিনি এখনো নোট বুকে নিবষ্ট মনে কাজ করে যাচ্ছেন। এ কামরার দেয়ালে ঝোলানো প্লাজমা টিভিতে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা চলছে নিঃশব্দে। টিভির সাউন্ড বন্ধ করা। শচীন টেন্ডুলকার আর গৌতম গম্ভীর ব্যাট করছে। স্ট্রাইকিংয়ে শচীন। বল হাতে তেড়ে ফুঁড়ে আসছে পিন্ডি এক্সপ্রেস শোয়েব আকতার। বলটা বাগে পেতেই শচীন প্যাডেল স্কুপ করে বলটা ডিপ থার্ডম্যান দিয়ে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। শচীনের প্রিয় শট এটা। পরের বলে কভার ড্রাইভ করলেন শচীন। চার রান। তৃতীয় বলটা ডিফেনসিভ খেলে ওভারের চার নম্বর বলকে পুল করে রান নেয়ার জন্য দৌড়াচ্ছেন, আমার চোখ আটকে গেছে প্লাজমা পর্দায়।

কি খাবেন? ঠাণ্ডা না গরম?

হঠাৎ কথা শুনে সম্বিত ফিরে পেলাম। চোখ এখন সৌম্য দর্শনের মুখের ওপর। মুখটা হাসি হাসি করে তার দিকে তাকিয়ে আছি। 'একটা কিছু হলেই হবে' বললাম আমি।

সরি, আপনাকে অনেক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। তিনি বেল টিপে পিয়নকে দু'কাপ কফি দিতে বললেন। বললেন, আসলে আমি আপনার কাজই করছিলাম।

আমার কাজ?

হ্যাঁ, আপনার কাজ। আপনার নিয়োগ পত্র টাইপ করছিলাম। তা আপনি মাসে কত টাকা বেতন আশা করেন?

কথাটা বুকে একটা ধাক্কার মতো লাগল। এলাম ইন্টারভিউ দিতে, এখন বলে বেতন কত চাই। কি বলব আমি। আমিতো কোনো প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি। গেলো দুই রাত আমার সাবজেক্ট নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেছি। মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম, ওইসব নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু কিসের কি। বেতন কত চাইব এটা নিয়ে মহা ধন্দে পড়েছি।

কি ভাবছেন, ভাবছেন এলাম ইন্টারভিউ দিতে। ওসব না হয়ে এখন বেতনের কথা সরাসরি জিজ্ঞেস করছি কেন সেটা?

আমি ঢোক চিপতে চিপতে বললাম, 'না, বিষয় সেটা নয়। আমি চাকরিটা কিভাবে পাচ্ছি সেটাই জানতে চাইছি। আমি কাউকে দিয়ে সুপারিশ করাইনি, তাহলে?

আমি আপনার বিষয়ে সব জানি। আপনার ওই নেতিবাচক কাজটাই আমাকে

আপনার বিষয়ে ইতিবাচক চিন্তা করতে বাধ্য করেছে। পিয়ন দু'কাপ ধোঁয়া ওঠা কফি দিয়ে গেল।

বেতনের বিষয়টা আমি বলতে চাই না। আপনি যেটা ভালো মনে করবেন সেটা দিলেই চলবে।

না না, আপনি বললে আমার জন্য কাজটা সহজ হয়ে যায়। আপনার যে যোগ্যতা, সে যোগ্যতা অনুযায়ী আপনার প্রাপ্য সম্মানীটুকু দিতে চাই।

প্লিজ আমাকে বলতে বলবেন না। এতোক্ষণের কথাবার্তায় আমি অনেকটা সহজ হয়ে গেছি। গরম কফি পেটে যেতেই নার্ভাসনেসটাও অনেকটা দূর হয়েছে। সাবলীলভাবে কথা বলে যাচ্ছি।

ঠিক আছে আমি একটা অ্যামাউন্ট বসিয়ে দিচ্ছি। আপনার অপছন্দ হবে না।

তিনি নোট বুকের কি-প্যাড চেপে অ্যামাউন্ট লিখে একটা কাগজ প্রিন্ট দিলেন। ওই প্রিন্টের কপি দিলেন আমার হাতে। কাগজটা দেয়ার সময় খেয়াল করলাম সৌম্য দর্শন মিটি মিটি হাসছেন।

ও হ্যাঁ, আপনাদের সৌম্য দর্শনের মানে আমার নিয়োগকর্তার নামটাই বলিনি। ওনার নাম নাসির আলী। বয়স ৪৫ পেরিয়েছে। দেখতে ছোটখাট। হাসি হাসি মুখ। পেটানো শরীর, কোথাও কোনো বাড়তি মেদ নেই। এ কারণে বয়স বোঝা যায় না। আমি নিয়োগপত্রের অন্য কোনো কিছু দেখলাম না। টাকার পরিমাণটা দেখে মনে হলো আমার চোখ কপালে উঠে গেছে; এতো টাকা! নাসির আলী সাহেব আমাকে বললেন।

যান মিষ্টি নিয়ে বাড়ি যান। বাবা মাকে খবরটা জানান। সামনের মাসের পয়লা তারিখে আপনি জয়েন করবেন। তবে হ্যাঁ, এখন আপনাকে চাকরির বিষয়ে কিছু কথা বলি। মন দিয়ে শুনুন। তিনি বলতে লাগলেন। কথা শেষ হবার পর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি আধঘন্টা পার হয়ে গেছে। এই আধঘন্টা আমি কোনো কথা বলিনি, শুধু হু হ্যাঁ শব্দ করা ছাড়া। খামে ভরা নিয়োগপত্রটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

মোড়ের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে ধরালাম। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সিগারেট শেষ করে বাসায় ফেরার জন্য একটা হলুদ ট্যাক্সি ক্যাব ডেকে তাতে উঠে বসি।

গাড়িতে এসি চলছে। তবুও ঘামছি, ভীষণ।

থার্ড আই ইনফরমেশনের কাজ হলো অ্যান্টি-ভাইরাস তৈরি করা। অ্যান্টি-ভাইরাস তৈরিতে তাদের বেশ সুনাম আছে।

থার্ড আই আমাকে বলেছে, ভাইরাস লিখতে, অ্যান্টি-ভাইরাস তৈরি করতে নয়। এটাই নাকি আমার চাকরি। কপাল আমার! যা হতে চাইনি তাই হতে হবে। এক সময়কার নিতান্ত খেয়ালী ছেলে মানুষী যে আমার জীবনে এতোবড় দুর্ভোগ বয়ে আনবে তাকি আমি জানতাম। সারাটা জীবন হয়তো আমাকে এভাবেই চলতে হবে। আমার নিস্তার নেই।

বাসায় ফিরে বিছানায় শুয়ে ভাবছি, চাকরিটা করব, নাকি করব না। শেষকালে কিনা হ্যাকারের তকমাটাই আমার জীবনের সাথে লেপ্টে যায়। শুয়ে এপাশ ওপাশ করছি। কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। যদিও এখন বিশেষ তাড়া নেই। হাতে সপ্তাহখানেক সময় আছে, জয়েন করতে। এর মধ্যে ভেবে একটা উপায় বের করা যাবে।

মাথা থেকে যতই ভাবনাটা দূরে ঠেলে সরাতে চাইছি ততোই যেন তা মাথার ভেতরে জাঁকিয়ে বসছে। শেষ পর্যন্ত আমি কি না পেশাদার হ্যাকার হব। আবার মনে পড়ে গেল নাসির আলী সাহেবের কথা।

'শুনুন আহির সাহেব, আপনি আমাদের ফার্মে জয়েন করে অ্যান্টি-ভাইরাস তৈরি করতে পারবেন না। আপনাকে ভাইরাস লিখতে হবে।

আপনি যে ভাইরাস লিখবেন তা যেন বেশি ক্ষতিসাধন করতে পারে। প্রতি তিন মাসে একটা করে ভাইরাস লিখে ইন্টারনেটে ছাড়বেন, এমনকি মেইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের পাঠাবেন। ওই মেইল খোলা মাত্র যেন কম্পিউটারে রক্ষিত সব তথ্য মুছে যায়। প্যারালালি আমাদের অন্য প্রোগ্রামাররা আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়ে অ্যান্টি-ভাইরাস আগেই তৈরি করা থাকবে,

ভাইরাস কম্পিউটারে আক্রমণ করে বসার দুই/একদিনের মধ্যে আমরা অ্যান্টি-ভাইরাস বাজারে ছাড়ব। অ্যান্টি-ভাইরাস কম্পিউটারের হারানো সব তথ্য উদ্ধার করতে পারবে।'

আমি ভাবি আর অবাক হই। এভাবে আমাকে কাজ করতে হবে? আমার চোখের সামনে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। তাহলে, এতোদিন যে শুনে এসেছি বিশ্বের বড় বড় ভাইরাস নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ভাইরাস তৈরি করে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়। আবার ওরাই অ্যান্টি-ভাইরাস বাজারে ছাড়ে। এভাবেই ব্যবসা করছে।

মনে পড়তে থাকে পেছনের সব ঘটনা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশ্বখ্যাত হ্যাকার ও'নেল ডি গুজম্যানের মুখ। এই ফিলিপেনো যুবক লাভবাগ নামের একটি ভাইরাস তৈরি করে সমগ্র দুনিয়ার কম্পিউটার শিল্পে আতঙ্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। তার লেখা ওই ভাইরাস বিশ্বের লাখো কম্পিউটার অচল করে দিয়েছিল। ক্ষতি হয়েছিল কোটি ডলারের। ফিলিপেনো পুলিশ গুজম্যানকে গ্রেফতার করলেও ওই দেশে তখন সাইবার আইন না থাকায় সহজে পার পেয়ে যায় গুজম্যান। কোনো সাজাই তাকে পেতে হয়নি। বরং তার লাভ হয়েছিল।

ওই ঘটনা তাকে বিশ্বময় খ্যাতি এনে দিয়েছিল। বড় বড় অ্যান্টি-ভাইরাস নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইন পড়ে গিয়েছিল গুজম্যানের বাসার সামনে। গুজম্যান দেখে শুনে সবচেয়ে বেশি দাম হাঁকানো কোম্পানিতে সে যোগ দেয়। ভাইরাস লেখক কেভিন মিটনিক কখনোই নিজেকে অপরাধী ভাবে না। সে নিজেকে সিকিউরিটি প্রফেশনাল [নিরাপত্তা পেশাজীবী] ভাবে।

গ্যারি মাকিনোন নামের এক হ্যাকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিরাপত্তা সিস্টেমে আক্রমণ করে। এই নিরাপত্তা সিস্টেমের মধ্যে আর্মি, এয়ারফোর্স, নেভি এবং নাসাও ছিল। হ্যাকিং ইতিহাসে এটাকেই বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম মিলিটারি হ্যাকিং বলে ধরা হয়। গ্যারির এ কাজে ক্ষতি হয় ৭ লাখ ডলার। হ্যাকিং ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আক্রমণ সংঘটনকারী ম্যাকিননের মামলা বর্তমানে বিচারাধীন আছেন।

ভাইরাস মেলিসার আক্রমণে ক্ষতি হয়েছিল ৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই ভাইরাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে ব্যক্তি এই ভাইরাসটি ই-মেইলের মাধ্যমে পায়, তাকে আরো ব্যক্তিকে পাঠাতে প্ররোচিত করা হয়। এভাবে এই ভাইরাসটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ৬৫ হাজার বার ছাড়া হয়। এই ভাইরাসটির লেখক ডেভিড স্মিথকে এ অপরাধের জন্য ৪০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

আরো কয়েকজন নামকরা হ্যাকারের কথা আমার মনে পড়ে। তারা হলো চেরনোবিল ভাইরাসের লেখক চেন ইং হাউ, সুতোমুতু শিমোমুরা, জন লিচ জোহানসেন, দিমিত্রি স্কাইরব, রিচার্ড স্টলম্যান, লিনাস টারভেল্ড, স্টিফেন ওয়াজনিয়াক, ডেনিশ রিটচি, কেন থমসন, জন ড্যাপার, জোহান হেলসিনজিয়াস,

টিম বার্নার লি। ভাইরাস লিখলেও এরা এখন কত বিখ্যাত মানুষ, মানুষের আদর্শ, পূজনীয়।

এদের কথা ভেবে আমিও সুখ স্বপ্ন দেখতে থাকি। কিন্তু সে সুখের সময়টা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। মার ডাকে আমাকে বিছানা ছাড়তে হয়। ভাত খেতে হবে।

ভাত খেতে খেতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। আমি জয়েন করব। আমাকে তো কেবল প্রোগ্রাম লিখতে হবে। যদিও কাজটা নেতিবাচক, তারপরও মন্দের ভালো। আমাকে হ্যাকার হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, ক্র্যাকার নয়।

এসব ভাবতে ভাবতে আমি আনমনে হেসে ফেলি। আমার হাসি দেখে মা ভ্রু কুঁচকে তাকায়। শুধায়—

কিরে, কি হয়েছে? একা একা পাগলের মতো হাসছিস কেন?

কিছু না মা, এমনিতেই হাসি। এ জবাবে মার মনের সন্দেহ দূর হয় না। বরং সন্দেহটা তার মনের আকাশে ঘনীভূত হয়। মা প্রশ্ন করতে থাকে। কিন্তু কোনো প্রশ্নই আমার কানে ঢোকে না। আমি আমার কাজটা নিয়ে ভাবতে থাকি। এই ভাবনার আকাশে হঠাৎ উঁকি দেয় ফাউল মিয়ার মুখ। এই আঁটসাট ভাবনার ভেতরে ফাউল মিয়ার মুখ ঢুকল কি করে? মার কথা যেখানে কানে তুললাম না সেখানে ফাউল মিয়ার মুখ! ঘটনা কি?

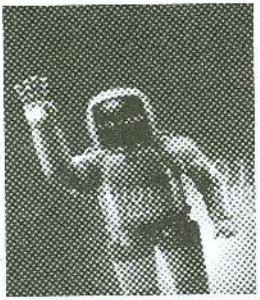

ফাউল মিয়া বিদায়ী সাক্ষাত করতে এসেছে দু'দিন বাদে তার ফ্লাইট। ওকে কেমন যেন বিমর্ষ লাগছে। চোখ দু'টো লাল, ফোলা ফোলা। মনে হয় কান্নাকাটি করেছে। হতে পারে। কাল বাদে পরশু চলে যাবে হাজার হাজার মাইল দূরের দেশে। দেশের সবার কথা ভেবে হয়তো ওর মন খারাপ। তাই ওসব নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না। বাসায় আমার কামরায় বসে আছি দু'জন। ও বিছানায় বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। আমি কিছু বলছি না, চুপ করে আছি। ও-ই মুখ খুলল।

শোন আমি ওখানে গিয়ে মাইক্রোসফটের অফিসে কিছুদিন কাজ করব। তারপর যদি কোথাও ভালো কিছু না পাই, দেশেও ফিরে আসতে পারি।

পেলে ফিরবি না? আমি জিজ্ঞেস করি।

বোকার মতো কথা বলিস না। ওখানে যাচ্ছি ফেরার জন্য নয়।

একেবারে থেকে যাবি?

আমিতো মহাপুরুষ টাইপের কেউ না যে আমাকে ফিরতেই হবে। আমি না ফিরলে এদেশের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। ফাউল মিয়ার গলাটা কেমন যেন শোনালো। ও বলছে, তোকে একটা কথা বলি মন দিয়ে শোন। যদিও তুই আমার কথা কখনোই মন দিয়ে শুনিস বলে মনে হয় না।

আমি হৈ হৈ করে উঠলাম। এটা তোর ভুল ধারণা। আমি বললাম।

হতে পারে। তবে এজন্য তুই দায়ী। যা হোক যা বলছিলাম। ফাউল মিয়ার চোখে মুখে সিরিয়াস ভাব ফুটিয়ে বলে, আমি তোকে কয়েকদিন আগে বলেছিলাম, ভ্যানিলা স্কাই অপারেটিং সিস্টেমে একটা সমস্যা আছে। বলেছিলাম কিনা?

হ্যাঁ, বলেছিলি। তো?

আমি ভেবেছি তোর মাথায় অনেক বুদ্ধি। আমার ওইটুকু বলাতেই তুই ব্যাপারটা ধরতে পারবি। কিন্তু এখনো বুঝলাম না, তুই কি ব্যাপারটা ভুলে গেছিস নাকি ভাবনাতেই রাখিস নাই?

ভুলে গেছি দোস্ত, বেমালুম ভুলে গেছি।

যা ভেবেছিলাম। যা হোক তোরতো ধারণা আমি মেধাহীন মানুষ। বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। আমার কথাবার্তা তোর কাছে অপলাপ বলে মনে হয়।

আমি মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবি, আরে ফাউল মিয়া দেখি গুছিয়ে কঠিন কঠিন কথা বলছে। ওর দিকে তাকাতেও আমার লজ্জা লাগছে। ওই ব্যাপারটাকে আমি একদমই আমলে আনি নাই। ব্যাপারাটাকে আর হেলাফেলা করা যাবে না। এখন আমাকে কি করতে হবে বল। বললাম আমি।

তুই কি করবি, সে তুই জানিস। আবারো সেই নির্লিপ্ত উত্তর। ভ্যানিলা স্কাই দেখে আমার মনে আমার মনে হয়েছে এতে বড় ধরনের কোনো ঘাপলা আছে কিন্তু আমি তা বুঝতে পারছি না। তুই ভ্যানিলা স্কাইটা একটু ঘেঁটেঘুটে দেখ কিছু বের করতে পারিস কিনা।

এবার আমি বেশ সিরিয়াসলি বিষয়টিকে নিলাম। ফাউল মিয়ার মতো মানুষ যদি একটা বিষয় বুঝতে পারে তাহলেতো আমার আরো বেশি বোঝার কথা!

আচ্ছা আমি দেখব। বললাম ফাউল মিয়াকে।

শুনে খুশি হলাম। এখন উঠি, অনেক রাত হয়ে গেছে। ভালো থাকিস। কবে দেখা হবে তা জানি না। আশা করি তুই আমাকে নিয়মিত মেইল করবি।

দূর থেকে মার গলার আওয়াজ পেলাম। মা ফাউল মিয়াকে রাতে খেয়ে যেতে বলছেন। ওকে নিয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে দেখি অনেক পদের আয়োজন ফাউল মিয়ার জন্য মা তার পছন্দের খাবার তৈরি করেছেন। আড় চোখে চেয়ে দেখি ফাউল মিয়ার চোখ টলটল করছে।

ফাউল মিয়া অনেকদিন বাদে বেশ তৃপ্তি করে খেল। রাতের খাবার শেষে বিদায় নেবার সময় ও আমাকে আবারো ভ্যানিলা স্কাইয়ের ব্যাপারটি মনে করিয়ে দিল। আর যাবার দিন গভীর রাতে ফ্লাইট হওয়া ও আমাকে বিমান বন্দরে যেতে নিষেধ করল।

আমি ফাউল মিয়াকে বিদায় দিলাম।

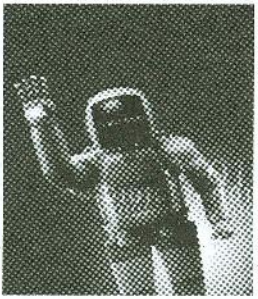

আজ আমি আমার নতুন চাকরিতে জয়েন করতে এসেছি। ফর্মাল হয়ে আসিনি, ক্যাজুয়াল পোশাকেই এসেছি। হাতে একটা ব্যাগ, দেখতে ল্যাপটপের ব্যাগের মতো। আসলে তা নয়। পেট মোটা এই ব্যাগের ভেতরে আছে একটি সোয়েটার। গরমের দিনে সোয়েটার গায়ে দিয়ে এলে লোকে পাগল বলবে। তাই ব্যাগে করে এনেছি। এই অফিসে যে ঠাণ্ডা তাতে করে সোয়েটার ছাড়া থাকা যাবে না।

অফিসে ঢুকলাম ঠিক সকাল সাড়ে নটায়। ওইদিন রিসিপশনে কাউকে দেখিনি। আজ একজন মহিলা বসা। কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একটা ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে মুখে ঝাপটা দিল। প্রমাদ গুনলাম। মনে হলো বরফের দেশে চলে এসেছি। রিসিপশন থেকে নিজের পাঞ্চ কার্ডটা নিতে গিয়ে রিসিপশনিস্ট মেয়েটির সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল।

কিন্তু হায়! একি। এই ঠাণ্ডার মধ্যে মেয়েটি উর্ধাঙ্গে কেবল মাত্র টি-শার্ট পরে আছে। পরনে কি আছে সেটি বোঝা গেল না। আমার পুরুষ চোখ দু'টো উদ্ধত। আমি নিজেকে সামলাই। 'হে পুরুষ, তুমি তোমার চোখ সামলাও।' কিন্তু সেতো দুর্বিনীত। সে তা মানবে কেন? সে আরো উদ্ধত হতে চাইল। এরই মধ্যে মেয়েটি মিহি গলায় সালাম দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সে নিজের পরিচয় দিল। ওর নাম অন্বিতা। দিনচারেক হলো ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ হিসেবে জয়েন করেছে। আজ যে আমার জয়েন করার কথা তা মেয়েটি জানে। ওর কাছেই জয়েনিং লেটার জমা দিতে হবে। মেয়েটি একটি টাইপ করা কাগজ আমার সামনে মেলে ধরল। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিতে গেলে আবারো আমার চোখ দু'টো অবাধ্য হয়ে ওঠে।

চোখ দু'টো দেখে, মেয়েটির বুক বরাবর টি-শার্টে কি যেন লেখা। কাগজ হাতে নিয়ে আমি টি-শার্টে কি আছে পড়ার চেষ্টা করি। চকিতে নিজেকে গুছিয়ে নিলাম।

একজন পুরুষের টি-শার্টের বুকে কি লেখা আছে তা পড়া যায় বা পড়ার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু একজন মেয়ের বুকের দিকে তাকিয়ে তার টি—শার্টে কি লেখা আছে তা পড়তে যাওয়াটা নিশ্চয় অভব্যতার পর্যায়ে পড়ে। মেয়েটি ব্যাপারটি বুঝল কি না কে জানে।

আমি কাগজে খসখস করে সই করে অন্বিতাকে ফেরৎ দিলাম। মেয়েটা যথেষ্ট সুন্দরী। কাঁঠালচাপা ফুলের মতো গায়ের রঙ। মিষ্টি করে হাসে। উচ্চতা ভালো। চুলগুলো ববকাট। কোনো ধরনের সাহায্য লাগলে মেয়েটি তাকে জানাতে বলল।

কথার ফাঁকে অন্বিতা জানালা, নাসির আলী সাহেব মানে আমার বস বলেছেন, মাঝে মাঝে অন্বিতা যেন আমাকে কাজে কর্মে সাহায্য করে। সহজ কথায় যাকে বলে সে আমার পি.এ। আমি ভেবে পাচ্ছি না, আমাকে কেন পি.এ দেয়া হবে। পি.এ আমাকে কি সাহায্য করবে।

মেয়েটি আমাকে বসার জায়গা দেখিয়ে দেবার জন্য যাচ্ছে। সে যাচ্ছে আমার আগে আগে। একটা কামরার সামনে এসে ও থামল। এটাই আমার বসার ঘর। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে আমার কামরাটা বেশ পছন্দ হলো। অন্বিতা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

কামরাটা খুব বেশি বড় না, আবার একেবারে ছোটও না। একটা সুন্দর টেবিল। টেবিলে ল্যাপটপ রাখা। পাশে কম্পিউটার টেবিল। টেবিলের ওপরে এলসিডি মনিটর বসানো। বসার ব্যবস্থা দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। একটা কাঠের চেয়ার রাখা ওখানে। টেবিলের সামনে দু'টো গদিআটা চেয়ার বসানো। টেবিলের ওপরে হারেক রকম জিনিস। কলমদানিতে কলম, পেপার ওয়েট, ফেবিস্টিক, স্ট্যাপলার, আলপিন, এন্টিকাটার, সিডি স্ট্যান্ডে ব্ল্যাংক সিডি ভরা, কি নেই। কামরাটা আমার একটু বেশিই পছন্দ হয়েছে।

অন্বিতা আধঘণ্টা পরে আসবে বলে বিদায় নিল। চেয়ারে বসে ভাবছি, এসব স্বপ্ন নয়তো। হঠাৎ পিয়নের ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। পিয়ন কফি এনেছে। কফির মগ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। কফিতে চুমুক দিয়ে মনে হলো, কফিটা ভালো। এরা ভালো কফিও রাখে।

কফি খেতে খেতে কখন যে অনমনা হয়ে গেছি। অন্বিতা এই ঠাণ্ডার ভেতরে কেন একটা টি-শার্ট পরে আছে। সোয়েটার গায়ে দিয়েও আমার মনে হচ্ছে, শীত লাগছে। ভাবনাটা বেশি দূর এগোলো না। অন্বিতা ফিরে এলো। এসেই তাগাদা দিল সব বিভাগের লোকজনের সাথে পরিচিত হতে হবে।

আমি আবার অন্বিতার পেছন পেছন গেলাম। একে একে সবার সাথে দেখা করে সব শেষে গেলাম সিইও সাহেবের রুমে।

অফিসের প্রথম দিনের অভিজ্ঞা ভালোই মনে হলো।

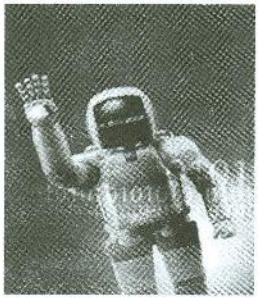

মাইক্রোসফটের সুদিন ফিরেছে। বিশ্বের সব দেশে ভ্যানিলা স্কাই চলছে। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম বন্ধ হয়ে গেছে। সারা বিশ্ব থেকে বিল গেটসের কাছে একের পর এক সুখবর আসছে। বিল গেটসের আনন্দ আর ধরে না। আসিমোকে দেখেও আনন্দিত মনে হচ্ছে। বিল গেটস তার কামরায় বসে ফোনে কথা বলছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মাইক্রোসফটের কান্ট্রি ম্যানেজাররা তাকে ভ্যানিলা স্কাইয়ের সুখবর জানাচ্ছে।

আসিমো তার কামরায় বসে মিউজিক প্লেয়ারে গান ছেড়ে দিয়েছে। তার মিউজিক প্লেয়ারে উচ্চগ্রামে বাজছে বনিএম ব্যান্ডের বাই দ্য রিভার্স অব ব্যাবিলন...। আসিমো গানের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে। পা ঠুকছে মেঝেয়। তার চেহারায় একটা প্রশান্তিময় ভাব। সে ঠিক এখনো বুঝে পাচ্ছে না, ভ্যানিলা স্কাইয়ের বিষয়টা তার মাথায় এলো কিভাবে। কি নিখুঁত পরিকল্পনা।

এ সময় আসিমোর মাথা বিপ বিপ শব্দ তুলল। আসিমো বুঝে গেল তার মাথায় বসানো সার্কিট থেকে এ শব্দ আসছে। তার মানে তার মাথায় বসানো সার্কিট, সেন্সর প্রসেস করে তাকে এ বুদ্ধি বাতলে দিয়েছে। সে বিল গেটসকে জানাতে পেরেছে তার নতুন পরিকল্পনার কথা।

বিল গেটস ইন্টারকমে আসিমোকে ডেকে পাঠালো। আসিমো গান বন্ধ করে হেলে দুলে সে বিল গেটসের কামরার দিকে হাটতে লাগলো।

বিল গেটসের কামরার সামনে এসে সব সময় আসিমোর একটা টোকা দেবার অভ্যাস। সে এক টোকা দিলে বিল গেটস বুঝতে পারে আসিমো এসেছে। ভেজানো দরজা খোলার পরে সে আরেকবার বিলের কাছে কামরার ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেয়। বিল যদিও অনেকবার তাকে না করেছে, টোকা দিয়ে ঢুকলেই চলবে, পুনরায়

অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আসিমোর ওই এক কথা, সে অনুমতি না নিয়ে ঢুকবে না।

আজ আসিমো সে রকম কিছু করল না। টোকাও দিল না, অনুমতিও নিল না। ভেজানো দরজা আস্তে করে ঠেলে সে ভেতরে ঢুকল। বিল গেটস চোখ বন্ধ করে চেয়ারে আধ শোয়া হয়ে আছে। আসিমো বিল গেটসকে ডাকল না। সে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

বিল গেটস চোখ বন্ধ করে ভাবছে। রোবট যে কাজ করে তা তার নিজের চিন্তা থেকে করে না। আগেই তা প্রোগ্রাম করা থাকে। যদি এ তত্ত্বই সঠিক হয় তাহলে আসিমো তাকে যে বুদ্ধি দিয়েছে তা তার মাথায় আগে থেকেই প্রোগ্রাম করা। এ বুদ্ধি তাকে অন্য কেউ দিয়েছে। তার মানে এসব ষড়যন্ত্র। এটা কিভাবে সম্ভব। তার মানে ষড়যন্ত্র করে তার তাকে পথে বসানোর চক্রান্ত করা হয়েছিল? তার এ ভাবনার মাঝখানে ফোনের রিং বাজতে শুরু করল। বিল গেটস চোখ খুলে দেখেন আসিমো দাঁড়িয়ে আছে। তিনি হাত ইশারায় আসিমোকে বসতে বলে টেলিফোনে কথা শেষ করে আসিমোকে বললেন, তোমাকে একটা বিষয় জিজ্ঞেস করব বলে ডেকেছি।

আমি জানি আপনি আমার কাছে কি জানতে চাইবেন। আসিমো বলল।

তুমি জান? ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমিতো আবার সব আগে থেকেই সব টের পাও। কথাটা বলে যেন বিল গেটস একটু লজ্জাই পেলেন। তিনি আসলে বিষয়টা ভুলে গিয়েছিলেন।

আমি আপনাকে পুরো বিষয়টা খুলে বলি। আসিমো বলল। আপনি ভেবেছেন, আপনার পুনরায় সাফল্য প্রাপ্তির ঘটনাটা কোনো চক্রান্ত কিনা। ব্যাপারটা অন্য কেউ আমাকে বলে দেয়নি। আমার ভেতরে এ বিষয়ে আগে থেকে কোনো প্রোগ্রাম করে দেয়া হয়নি। এটা আমি নিজে থেকেই করেছি। আমি মাঝে একবার নিজেই আমার সার্কিট খুলে কিছু প্রোগ্রাম পরিবর্তন করি। যার ফলে আমার ভেতরে যেসব প্রোগ্রাম আগে করা ছিল সেগুলো বদলে ফেলি। যার ফলে এরপর থেকে আমি নিজেই সব কিছু চিন্তা করতে পারি।

এ কথা শুনলে হয়তো আমার সৃষ্টিকর্তাও বিশ্বাস করবে না। আর সাধারণ মানুষতো নয়ই। অনেক রোবট বিশেষজ্ঞ এটা বিশ্বাস করবে না। আমি ওই ফর্মুলা ইন্টারনেট ঘেঁটে বের করেছি। আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। অন্তত আমার বিষয়ে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি আপনার উপকার করতে না পারলেও কোনো ক্ষতি করব না।

বিল গেটস যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে এ প্রসঙ্গ থাক। অন্য বিষয়ে কথা বলি। আমি ভ্যানিলা স্কাইয়ের কোড লিখে ফেলেছি।

কোডটা সঠিক হয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখার দায়িত্ব তোমার। কোডিংটা আমার কম্পিউটার থেকে নিয়ে যাও। পরীক্ষা করে দেখো।

পরীক্ষা করে যদি দেখি সঠিক হয়েছে, তাহলে কি করব?

সেটা তোমার মাথায় বসানোর ব্যবস্থা করব। আমি সব ঠিক করে রেখেছি। কিভাবে তোমার মাথায় ওই কোডিংটা বসানো হবে।

আমি কি তাহলে যাব?

হ্যাঁ যাও।

আচ্ছা আসি বলে আসিমো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিল গেটস আসিমোর চলে যাওয়া দেখলেন। বিল গেটস তার কাজে মনে দিয়েছেন কি দেয়নি, আসিমো আবার ফিরে এলো। বিল গেটস অবাক হলেন আসিমোকে ফিরে আসতে দেখে। বিল গেটস কিছু বলার আগে আসিমো বলল...

মাথায় কোডটা যে বসাবেন সেটা কি সঠিক সময়ে কাজ করবে? ওটা কিভাবে ঘটাবেন?

সব ঠিক করা আছে। তোমাকে ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। তাছাড়া তুমিতো সব জান। তোমারতো আগে ভাগেই সব জানা।

তা জানি কিন্তু সব সময় মনে থাকে না। তাই জানতে চাইছি।

তোমার মনে থাকে না? বিল গেটস অবাক হলেন। এটা কি বল?

কি জানি, হয়তো সবই জানি। মাঝে মাঝে সব জানাটাই কেন যেন না জানার মতো মনে হয়। এসব শুনে বিল গেট ভারি অবাক হলেন। তিনি ভাবলেন, আরে এ সময় আসিমোর কি হলো। কি বলছে এসব।

তোমার মাথা ঠি আছেতো?

মাথা ঠিক আছে বলে আসিমো হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

বিল গেটসের কাছে আসিমোর এ হাসি রহস্যময় বলে মনে হলো। কি জানি কি হয়েছে ওর। তবে সমস্যা যে হয়নি সেটা বেশ বুঝলেন তিনি। তার মনে হলো সবই ঠিক আছে।

আসিমো ফের বিল গেটসের কামরায় ফিরে এলো। সে জানাল, কোডিং ঠিক আছে। কোনো সমস্যা নেই।

ঠিক আছে রাতে তোমার মাথায় ওটা বসিয়ে দেব। বিল গেটস বললেন।

প্রক্রিয়াটা জানতে পারি?

প্রশ্ন শুনে বিল গেটসের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ওই হাসি দেখে আসিমো বলে, না না, ঠিক আছে। বলতে হবে না। সব বুঝি।

রাতের বেলায় আসিমোর মাথায় ভ্যানিলা স্কাইয়ের কোডিংটা বসানো হলো। বিল গেটস বেশ খুশি, কাজটা একবারে ওকে হওয়াতে। আসিমোর অস্বস্তি হলে লাগল।

কেন আসিমোর অস্বস্তি হবে, আসিমোতো যন্ত্রমানব। তার মাথায় নতুন কিছু ঢুকালে তার কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। তবে কেন তার সমস্যা হচ্ছে?

কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে? বিল জিজ্ঞেস করলেন আসিমোকে।

ঠিক বুঝতে পারছি না।

ব্যাপারটা নিয়ে হেলাফেলা করো না। কেমন লাগছে?

না, ঠিক বড় ধরনের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তবে মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। মাথার ভেতর এক ধরনের ভোঁতা শব্দ হচ্ছে। আপনি শুনতে পাচ্ছেন?

বিল গেটস তার মাথাটা আসিমোর মাথার কাছে নিয়ে ওর মাথায় কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করল কোনো শব্দ হচ্ছে কিনা। না তিনি কোনো শব্দ শুনতে পেলেন না। তিনি বললেন, হয়তো কোনো যান্ত্রিক শব্দ হচ্ছে যা আমি শুনতে পাচ্ছি না। ঠিক আছে তুমি যাও। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও। আমি কিছু জরুরি কাজ সারি।

আসিমো লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত ঘর থেকে অদৃশ্য হলো। বিল গেটস তার কাজে ডুবে গেলেন।

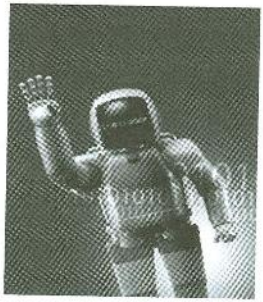

আহিরের নতুন অফিসে তার কাজ ভালোই চলছে। ভারিক্কি কোনো কাজ তাকে দেয়া হয়নি। তার টেবিলে কোনো ফাইলপত্ররও নেই। কেবল নেট ব্রাউজ করাই তার কাজ। সারাদিন কাঁহাতক আর নেট ব্রাউজ করতে ভালো লাগে। তার কাজ চাই। এভাবে একটা মানুষ দিনের পর দিন কাজ না করে থাকতে পারে? অন্যরা পারলেও আহির পারে না। সে নেটে ঘুরে ঘুরে কাজ খুঁজতে থাকে। ভালো লাগে না তার। একঘেঁয়েমি কাটাতে সে চলে যায় অন্বিতার কাছে।

অন্বিতা এক মনে কাজ করছে। তার এক কানে ফোনের রিসিভার ধরা, অন্য হাতে কি যেন লিখছে। এত দ্রুত লিখছে যে খস খস শব্দ হচ্ছে। আহির অন্বিতার সামনে পাতা একটা খালি চেয়ার দেখে তাতে বসে পড়ল। অন্বিতা কাজ করে যাচ্ছে এক মনে। তার সামনে আহির বসে থাকায় তার অস্বস্তি হতে লাগল। আহিরেরও কোনো কাজ নেই। আর কাজ যেহেতু নেই সেহেতু অন্বিতার সামনে বসে থাকতেও তার কষ্ট হচ্ছে।

সে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাড়াল। বাইরের দৃশ্যটা তার বেশ লাগল। বিল্ডিংটার পেছনে খোলা জায়গা। মাঠে ঘাস আছে। সবুজ রঙের ঘাস দেখতে চোখে আরাম লাগছে আহিরের। তার এমন অবস্থা দেখে অন্বিতার অস্বস্তি কমে গেল। বেশ কিছুটা সময় যাবার পরে আহির পরিপূর্ণভাবে খেয়াল করল অন্বিতাকে।

অন্বিতা বেশ সাজুগুজু করে অফিসে এসেছে আজ। নীল রঙা একটা সিল্কের শাড়ি পরেছে। মেকআপও করেছে বেশ কড়া করে। অন্বিতা পেছন ফিরে একটা বক্স ফাইল বের করে কি যেন দেখছে। অন্বিতার পিঠটা বেশ খোলা। পিঠের অনেকটা দেখা যাচ্ছে। পিঠেও কি মেকআপ করেছে সে। এত মসৃণ দেখাচ্ছে না তার পিঠটা। আহিরের দৃষ্টিও যেন পিছলে যেতে চায়। একি দেখছে সে। কারোর সৌন্দর্য এমন মসৃণ মোলায়েম হয় যে তাতে দৃষ্টি পড়লে তা পিছলে যায়! কি জানি আহির আর ভাবতে পারল না। সে তার রুমে চলে গেল।

ওপেন হাউজ নামের একটি কোম্পানি থার্ড আই থেকে আহিরকে নিতে চায়। আহির বুঝতে পারছে না তাকে ওই প্রতিষ্ঠান কেন নিতে চায়। সে থার্ড আইতে এমন কোনো কাজ করেনি যে যার সাফল্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে,

সবাই দলে দলে ছুটে আসছে তাকে নিতে। এমন ভাবনার মধ্যে নাসির আলীর ফোন এলো আহিরের কাছে। ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে আহির ছুটল নাসির আলীর রুমে।

নাসির আলী তার রুমে চিন্তিত মুখে পায়চারি করছে। আহিরকে দরজা দিয়ে গলা বাড়াতে দেখে বলল,

আরে আহির সাহেব যে, আসুন আসুন।

স্যার আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ, একটা বিশেষ সমস্যায় পড়ে আপনাকে ডেকেছি। ওপেন হাউজের যন্ত্রণায়তো আর পারছি না। ওরা বিভিন্নভাবে আমাদের সমস্যা করছে। ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে আমাদের।

কি করতে চান আপনি?

সেটাই ভাবছি। কিন্তু ভেবেতো কোনো কুল কিনারা করতে পারছি না।

স্যার এর সমাধান কি? আগামী মাসে আমাদের অ্যান্টি-ভাইরাস বাজারে আসবে। আমারতো মনে হয় তার আগেই আমাদের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

ঠিকই বলেছ। তবে এর সমাধানটা বেশ কঠিন।

কি রকম?

ওরা আসলে তোমাকে চায়। তোমাকে ওদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে দিলেই ওরা কেবল আমাদের এ সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে।

এসব আপনি কি বলছেন স্যার?

ঠিকই বলছি। কি করি বলোতো?

আমারতো মনে হচ্ছে আমি চলে গেলে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং সমস্যা আরো জটিল হবে। আমাকে হয়তো ওরা আপানর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাবে। তারচেয়ে বরং আমরা এক কাজ করি। আমরা ওদের সমস্যাকে সমস্যা মনে না করে আগামী মাসে অ্যান্টিভাইরাসটা বাজারে ছেড়ে দিই। বাজারে ভালো একটা অবস্থান তৈরি করলে ওরা আর আমাদের পিছু নেবে না। তার আগে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে আমাদের অফিসে এমন কেউ নেইতো যে ওদের লোক। সব তথ্য আগাম পাচার করে দিচ্ছে। রেড ডট অ্যান্টিভাইরাসের বেলায় তো ওরা আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খবরটা কিভাবে ওদের কাছে গেল আজো তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

বিষয়টা আসলে ভাববার মতো। তুমি কি বলো?

স্যার বিষয়টা আমার ওপর ছেড়ে দেন। আমি দেখছি কি করা যায়।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আহির তার রুমের দিকে চলে গেলো। নাসির আলী তার চেয়ারে হেলান দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তার মাথায় এখন একটাই ভাবনা—সোর্স।

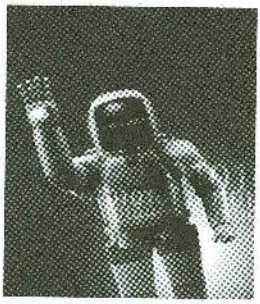

ফাউল মিয়াকে চাকরি দিয়েছেন বিল গেটস। যে সে চাকরি নয়, এজেন্টের মাধ্যমে একেবারে বাংলাদেশ থেকে ডেকে এনে তাকে চাকরিতে বসানো হয়েছে। ফাউল মিয়া নিজেই এখনো কোনোভাবে বুঝে উঠতে পারেনি, তাকে কেনো এতো বড় চাকরি দিলেন বিল গেটস।

ফাউল মিয়ার কাজ তেমন কিছু না, আসিমোকে দেখভাল করা মাত্র। এই সহজ কাজ পেয়ে ফাউল মিয়া বেজায় খুশি। এতো সহজ কাজ।

কিন্তু এতে বড়ই ত্যাক্ত বিরক্ত আসিমো। তাকে দেখার জন্য লোক রাখার দরকার কি। সে মানবকুলের চেয়েও বেশি বুদ্ধি রাখে। তারপরও মনিবের আদেশ বলে কথা। সে মেনেই নিয়েছে ফাউল মিয়াকে।

ফাউল মিয়া দায়িত্ব নেবার পরে ভেবেছিল তাকে আসিমোর জন্য অনেক কাজ করতে হবে। কিন্তু না তাকে কোনো কাজই করতে হয় না। সে তার বিশাল ঘরে বসে নোট বুকে সারাদিন কেবল হলিউডের মুভি দেখে। তার মুভি দেখা দেখে মনে মনে একটু বেশিই খুশি হয় আসিমো। 'যাক বাবা বাঁচা গেল। ওই লোকটা আমাকে বেশি বিরক্ত করবে না। সে তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।'

ফাউল মিয়া সারাদিন মুভি দেখে আর মাঝে মাঝে আসিমোর ঘরে গিয়ে উঁকি দেয়। জানতে চায় তার কিছু লাগবে কিনা। আসিমো বরাবরই বলে, 'না এখন কিছু লাগবে না। লাগলে আমি আপনাকে জানাব।' ফাউল মিয়া বুঝে গেছে, আসিমো তাকে ডাকবে না। সে তার তার ঘরে ফিরে এসে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে ভাবে, 'সে কি ছিল, আর এখন সে কি হয়েছে, আছে স্বপ্নের দেশে।'

ফাউল মিয়া স্কুল জীবনে উল্লেখ করার মতো কোনো ছাত্র ছিল না। কোনো রকমে টেনেটুনে ওপরের ক্লাসে উঠত। বসত ক্লাসের একদম পেছনের বেঞ্চে। কোনোদিন ক্লাসের পড়া সে পেরেছে কিনা তা নিজেও মনে করতে পারে না।

বন্ধুরাও তাকে ক্ষেপাত। তার ওমন সুন্দর নামটা আহির ভেঙে চুরে কি অবস্থাই না করেছে। তার পরও সে রাগ বা মন খারাপ করেনি। সে রাগ করতো না দেখে বন্ধুরা তাকে কটু কথা বলতেও ছাড়তো না। মেরুদণ্ডহীন মানুষ বলে সবাই তাকে ক্ষেপাত।

জবাবে সে বলত, 'রাগ করতে যে মানসিক শক্তি লাগে তাও আমার নেই। তাই রাগ করি না, মনও খারাপ হয় না।' এসব বলে সে বরাবরই পার পেয়ে এসেছে। অথচ সে এখন কোথায়। সে কি জীবনে ভেবেছিল, কখনো সে মার্কিন মুলুকে আসতে পারবে? তার কোনো বন্ধু কি এ দেশে আসতে পেরেছে। না পারেনি। সেই-ই এখন পর্যন্ত একমাত্র। হোক না কাজটা ছোট, কিন্তু তা দেশের তুলনায় অনেক বড় কাজ।

ফাউল মিয়া এখনো জানে না মাইক্রোসফটে তার চাকরি হলো কিভাবে। হঠাৎ একদিন তার অফিসের ঠিকানায় একটা চিঠি এলো। চিঠিতে বিস্তারিত লেখা। তার চাকরি হয়েছে মাইক্রোসফটে। কয়েকদিন সে ছিল ঘোরের মধ্যে। সে বিশ্বাসই করতে পারেনি এ বড় খবরটা। সে তার এ খবরটা তার বসকে বলতে গেলে তিনি কেবল মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'তোমার জন্য আরো চমক আছে। পরে আস্তে আস্তে সব জানতে পারবে।'

সে অবশ্য জানতে পারেনি কি সেই চমক। তবে এখনো সেই পরের সময়টা হয়েছে কিনা সেটা জানে না ফাউল মিয়া। সে জানতেও চায় না। সে যা পেয়েছে তাতেই খুশি। সে কেবল এটুকু মাথায় রেখেছে তার আগের অফিসের বস তার কাছে একটা জিনিস চাইবে। সে কথা দিয়েছে তার বসের কাজটা সে করে দেবে।

ফাউল মিয়া মার্কিন মুলুকে আসার পরে তার পুরনো বন্ধুরা তার সাথে ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। যারা তাকে মোটেও পাত্তা দিত না তারাও এখন তাকে ফোন করে, মেইল করে। ফাউল মিয়া ওগুলো পেয়ে কেবল হাসে। কারুর উত্তর দেয় না। মিটিমিটি হাসে। যে দু'একজন তাকে বিশেষ পাত্তা দিত তাদের সাথে ফাউল মিয়া নিজেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। এদের একজন হলো আহির। আহিরকে ফাউল মিয়া একটু বেশিই পছন্দ করে। সে সবার সাথে রাগ করলেও আহিরের সাথে করে না। এর কারণ ফাউল মিয়া নিজেই জানে না।

ফাউল মিয়ার সাথে বিল গেটসের বার কয়েক দেখা হয়েছে তবে কোনো কথা হয়নি। এক ফ্লোরে অফিস হলেও সে বিল গেটসের সাথে কথা বলার সুযোগ পায়নি। তার ইচ্ছে বিল গেটসের সাথে দেখা করে কথা বলা।

ফাউল মিয়া একটা নতুন বুদ্ধি বের করেছে, সে বিল গেটসের সাথে দেখা করবে। তবে তার আগে হাত করতে হবে আসিমোকে।

আসিমো বুঝতে পেরেছে ফাউল মিয়ার মনোভাব। ফাউল মিয়া আসিমোর

সাথে সখ্য গড়ার আগেই সে ফাউল মিয়ার সাথে মোলায়েম গলায় কথা বলতে শুরু করে। ফাউল মিয়া বেশ অবাক হয় আসিমোর ব্যবহারে। আসিমো বলে...

আমি ভেবে দেখলাম, আপনি মানুষটা খারাপ না। ভালো। আচ্ছা আমাকে আপনার কেমন লাগে?

ভালো। ছোট করে উত্তর দিল ফাউল মিয়া। মনে মনে সে একটু চমকালোও বটে।

শুধু ভালো, আর কিছু না?

আপনি আমার বস। ঠিক ওভাবে ভাবিনি, আপনি মানুষ হিসেবে কেমন। আসিমোর মুখে যান্ত্রিক হাসি। হাসিটা অবশ্য ফাউল মিয়া চোখে পড়ল না। এড়িয়ে গেল। আসিমোর মনে পড়ল, ফাউল মিয়া এখনো জানে না যে, আসিমো মানুষ নয় যন্ত্রমানব। সে আরো সতর্ক হয়ে ফাউল মিয়ার সাথে কথা চালিয়ে যেতে লাগলো।

ফাউল মিয়ার মনে একটু খটকা লাগলো। আসিমো হঠাৎ তার সাথে এমন মোলায়েম স্বরে কথা বলছে কেন। সেতো ফাউল মিয়াকে সহ্যই করতে পারে না। তাহলে তার এ হঠাৎ পরিবর্তন। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। বিষয়টা ভাববার মতো।

ফাউল মিয়ার মনে আসিমোর কথা এবং তার হাঁটাচলা নিয়ে কেমন যেন খটকার মতো লাগল। সে কথা বলছে আসিমোর সাথে, সেই সাথে খেয়াল করছে তার গতিবিধি। আসিমোও বিষয়টা খেয়াল করেছে, সে যেন আরো সতর্ক হয়ে উঠল। কিন্তু সে সতর্কভাব আপাতদৃশ্যে ভোলাভালা, সহজ সরল ফাউল মিয়ার অনুসন্ধানী চোখ এড়াতে পারল না।

আসিমো তার ভাষ্য অনুযায়ী, কে কি ভাবছে তাও বুঝতে পারে। আশে পাশে কি ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝতে পারে না। বুঝতে যে পারে না সেটা এতোদিন গোপন ছিল, কিন্তু তা প্রকাশ হয়ে গেল ফাউল মিয়ার কাছে। সে একদিন একটি কাজ নিয়ে যায় আসিমোর কাছে, আসিমো ওই সময় চোখ বন্ধ করে ছিল। ফাউল মিয়া ওই সময় একটা ফাউল করে বসে।

সে এমন একটি কাজ করে যে কাজটা করার ফলে তার মনে হয় আসিমোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সে সব কাজ করতে পারে না। আসিমো ঘুম থেকে জেগে দেখে ফাউল মিয়া তার সামনে সোফায় বসে আছে। ফাউল মিয়া তার কাজটা সেরে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকাল। ফাউল মিয়া তার মনিবের আসার আগেই অফিসে আসে। এসে দেখে রুম খালি। সে কোনো কিছু না ভেবে ঘরের সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত কোনো কিছুই তার চোখ এড়ায় না। হঠাৎ ফাউল মিয়ার চোখ পড়ে টেবিলের ড্রয়ারে। ড্রয়ারে চাবি ঝুলছে।

সে যেন মনে মনে একটু চমকালো। নাকি চমকালো না। সে দ্রুত ড্রয়ার খোলে। একটা-দুইটা-তিনটা—সে সব কটা ড্রয়ার খুলে ফেলে। ফাউল মিয়া সাবধানতার সাথে একটার পর একটা ড্রয়ার ঘুটে দেখে এর মধ্যে আছে কিছু কাগজ পত্র, চার্জার এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু। ফাউল মিয়া কিছু কাগজ পকেটে পুরে নিল।

সে ভালো করে দেখতে থাকে চার্জার। চার্জারটা যেন কেমন। মোবাইল চার্জারের মতো লাগছে না। ফাউল মিয়া এমন চার্জার আগে কখনো দেখেছে কিনা মনে করতে পারে না। এ চার্জার দিয়ে কি হয়? ফাউল মিয়ার মাথায় একের পর এক প্রশ্ন আসতে থাকে। চার্জার কেন আসিমোর ড্রয়ারে থাকবে? যদি এটা মোবাইলের চার্জার হয় তাহলে বেশ কিন্তু এটা এখানে থাকবে কেন, আসিমোতো মোবাইল ব্যবহার করে না। যদি অন্য চার্জার হয় তাহলে এটা এখানে থাকবে কেন। থাকবে বাইরে।

কি এমন মূল্যবান জিনিস এটা যে বাইরে রাখা যাবে না। বিষয়টা ফাউল মিয়ার নরম মনে বিশেষভাবে গেঁথে গেল।

এতো কিছু যে হলো, আসিমো কিছুই জানতে পারল না। ফাউল মিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে আসিমো তার অফিস কক্ষে প্রবেশ করে। সে তার চেয়ারে বসার পরপরই তার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। আসিমোর মনে পড়ে, আজ তার চার্জ নেয়া হয়নি। একটু পরই তার জীবনী শক্তি ফুরিয়ে যাবে। এখনই তাকে চার্জ নিতে হবে। সে তার রুমে দরজা লক করল। দরজা যে লক হলো না বুঝতে পারল না আসিমো। তার মাথা কাজ করছে না। কাজ করার মতো অবস্থায়ও নেই। যে কোনো সময় সে কোমায় চলে যাবে।

সে ড্রয়ার থেকে চার্জার বের করে সোফায় শুয়ে চার্জ নিতে লাগল। আসিমো চার্জ নিচ্ছে। তার চোখ দু'টো বন্ধ। আস্তে আস্তে পা নাচাচ্ছে। আসিমোর মাথা ঝিম ঝিম ভাবটা কেটে যাচ্ছে। যত সময় যাবে ততোই তার মাথা ঝিম ঝিম ভাবটা কেটে যাবে। চার্জ শেষ হলে ঝিম ঝিম ভাবটা একদম থাকবে না।

ফাউল মিয়া তার রুমে বসে আসিমোর ড্রয়ার থেকে আনা কাগজগুলো দেখছে। কাগজগুলোয় ইংরেজিতে কি সব লেখা।

সে উদ্ধার করতে পারছে না। কি সব জটিল অংক, সেগুলোও সে ধরতে পারে না সে। একের পর এক কাগজ ঘাটতে ঘাটতে ফাউল মিয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ কাগজ পেয়ে যায়। কাগজে কিছু সংকেত লেখা। কোড নাম্বারের কথাও লেখা আছে। সে অনেক কষ্টে যে লেখাটুকু উদ্ধার করতে পারল তা অনুবাদ করলে এ রকম দাঁড়ায়, '২০২৫ সালে বিশ্বের সব কম্পিউটার অচল হয়ে যাবে। যেসব কম্পিউটারে ভ্যানিলা স্কাই অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার হচ্ছে সেসব কম্পিউটার একযোগে অচল হয়ে

পড়বে। ক্ষতি হবে অগুণতি। সারা বিশ্বের প্রায় সব কম্পিউটার অচল হয়ে পড়লে তা সচল করতে সে সময় পুনরায় বাজারে আসবে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম।'

কি সাংঘাতিক! একি করছি আমি! এতো বড় ষড়যন্ত্র। যতটা বেশি অবাক হবার কথা ঠিক ততটা অবাক হলো না ফাউল মিয়া। সে অবশ্য এসবের কিছু কিছু আগেই জানত। জানত! কই কাউকে তো সে বলেনি। কেন বলেনি?

এ প্রশ্ন নিজেই নিজের কাছে বারবার করেছে ফাউল মিয়া। তার চিন্তায় একটু ছেদ পড়ল। তার চিন্তায় চলে আসে আসিমো। আসিমো অনেকক্ষণ হয় অফিসে এসেছে কিন্তু ফাউল মিয়াকে এখনো ডাকেনি। কখন ডাক আসবে? সে কি একবার যাবে তার বসের রুমে। অনেক কথাই ভাবতে থাকে ফাউল মিয়া। 'যাই, বরং একটু ঘুরে ফিরে দেখে আসি।' নিজেই নিজেকে কথাটা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ফাউল মিয়া।

BANSDOC Library
Accession No. 21111

ফাউল মিয়া আসিমোর রুমের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ না, ভেজানো। ফাউল মিয়ার আর তর সইছে না। তার খুব ইচ্ছে করছে ভেতরে আসিমো কি করছে তা দেখতে। সে আস্তে আস্তে দরজায় ভেতরের দিকে চাপ দিল। দরজা একটু একটু করে ফাঁকা হচ্ছে। ভয় লাগছে ফাউল মিয়ার, যদি দেখে ফেলে আসিমো। তার বুক ধুকধুক করছে। হৃৎপিণ্ডটা এমনভবে লাফাচ্ছে যেন এখুনি তা পাঁজর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। যদিও তার ভয় পাওয়ার কথা নয়। সে তার বসের ঘরে আসবে তাতে ভয় পাওয়ার কি আছে। কিছু নেই। কিন্তু ওই যে একটা গোপন খবর সে জেনেছে। আরেকটা সন্দেহ তার মনে বাসা বেঁধেছে। সব মিলিয়ে সে নিজেই একটা কুণ্ঠার মধ্যে পড়েছে। আসিমো কি বুঝে ফেলেছে যে ফাউল মিয়া তার গতিবিধি অনুসরণ করছে। তার আসল পরিচয় কি জেনে গেছে সে—এসব কারণেই ফাউল মিয়ার ভয়ের শেষ নেই।

তার হৃৎপিণ্ড এখন এমন শব্দ করে লাফাচ্ছে যে সে শব্দ ফাউল মিয়া যেন শুনতে পারছে।

ফাউল মিয়া দরজা ঠেলে তার মাথাটা একটু ভেতরে ঢুকিয়েছে। না, আসিমো তাকে দেখেনি। সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। কোনো নড়াচড়া নেই। নেই শব্দ। এসব দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন ফাউল মিয়া চমকে উঠল, আরে সে একি দেখছে। আসিমো কি চার্জ নিচ্ছে? ওইতো কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই চার্জার। চার্জারের প্লাগ সুইচ বোর্ডে লাগানো। সুইচ বোর্ডে সুইচ অন করা। চার্জারের অন্য প্রান্ত আসিমোর পায়ের তলায় লাগানো।

পায়ের তলায় লাগানো কেন? তাহলে কি আসিমো চার্জ নিচ্ছে। না না, ভাবতে পারে না সে। ফাউল মিয়া একা একা বিড় বিড় করতে থাকে, 'এসব কি করে হয়!

উনি মানুষ না? রোবট? এতোদিন তাহলে সব ভুল জেনে এসেছি। আর মানুষই যদি হবে তাহলে চার্জ নিবে কেন। না না, এতো অল্পতেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না।' সে আস্তে করে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বের হয়ে আসে। ফিরতে থাকে তার রুমের দিকে।

ফাউল মিয়ার মাথা আউলা হয়ে গেছে। সে কিছুতেই মেলাতে পারছে না, এটা কিভাবে সম্ভব। সে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকে।

ক. আসিমো কেন চার্জ নেবে? যদি চার্জ নেয়ার ঘটনা সঠিক হয় তাহলে ধরে নিতে হবে সে মানুষ না, রোবট।

খ. যদি রোবট হয় তাহলে মানুষ বেশ ধরে আছে কেন? কেন এটা সবার কাছে বিশেষ করে তার কাছে কেন গোপন রাখা হয়েছে কেন?

গ. ফাউল মিয়া আসিমোকে কখনো কিছু খেতে দেখেনি। তাহলে সে কি খায় না?

ঘ. আসিমো কেন এমন যান্ত্রিকভাবে হাটে? তার চলায় একটা অদ্ভুতভাব আছে, আছে ছন্দ। সেটা গভীরভাবে তলিয়ে দেখলেই কিন্তু বোঝা যায়।

এখন ফাউল মিয়ার অনেক কিছুই মনে পড়ছে। একের পর তা মিলিয়ে দেখতেই তার চুল খাড়া হবার দশা। সে আরো বেশি সতর্ক হয়ে উঠল।

ডাক এলো আসিমোর ঘর থেকে। পড়ি কি মরি করে ফাউল মিয়া ছুটল আসিমোর রুমের দিকে।

আসিমো তার ঘরে পায়চারি করছে। হাত পেছনে বাঁধা। সে অপেক্ষা করছে ফাউল মিয়ার জন্য। ফাউল মিয়া টক টক করে শব্দ তুলল দরজায়। ভেতরে যাবার অনুমতি নিতে হবে। ভেতরে যাবার অনুমতি এলো। ফাউল মিয়া আসিমোকে ধন্যবাদ দিয়ে ভেতরে ঢোকে। তার বুকে ধুকপুকুনি এখনো চলছে, আসিমো জেনে ফেলেনিতো যে সে সব বুঝতে পেরেছে!

ফাউল মিয়া আসিমোর কথা শুনে চমকালো। এসব কি শুনছে সে! সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। যদিও বিষয়গুলো সে আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিল। আজ পুরোপুরি জানল। কিন্তু আসিমো তাকে এসব বলছে কেন। সে আসিমোর কাছে জানতে চাইল—

আমাকে এসব কেন জানানো হচ্ছে জানতে পারি?

বিশেষ কোনো কারণ নেই। এমনিতেই। তবে এসব বিষয় আপনাকে জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি। সবটা জানলে আপনার কাজ করতে সুবিধা হবে।

আমি আপনার একজন পিয়ন মাত্র। এসব আমার জানার দরকার কি?

দরকার আছে।

ঠিক আছে আপনি বলুন। ফাউল মিয়া শঙ্কিত। মনে মনে ভাবছে কি কথাই না বলে আসিমো। আজ বুঝি খারাবিই আছে। চাকরিটা না চলে যায়। এই মার্কিন মুলুকে এসে যদি চাকরি চলে যায় এখানে থাকবই বা কি করে? দেশে ফিরে গিয়েই বা কি বলব। এসব অ-কথা, কু-কথা ভাবছে সে। তার মৌনতা ভাঙল আসিমোর ডাকে।

কি ভাবছেন?

না, কিছু ভাবছি না।

না জানতে চাইলে জানাবেন না, তবে আমি এখনো মনে করি, আপনার জানা দরকার।

ঠিক আছে, আপনি বলুন। ফাউল মিয়া আন্দাজ করতে পারছে আসিমো কি বলবে।

আমি মানুষ নই, রোবট। এ কথা বলেই আসিমো তাকাল ফাউল মিয়ার মুখের দিকে। দেখতে যে, এ কথা শুনে সে চমকায় কিনা। না চমকালো না ফাউল মিয়া। ভাবলেশহীন মুখ। আসিমো ঠিক বুঝতে পারল না ব্যাপারটা ফাউল মিয়া জানে কি না। ফাউল মিয়াও এমনভাব করছে যেন কিছুই জানে না। সে কেবল কোনো মতে মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের করল তা প্রশ্ন আকারে—

মানে? কোনো মতে ঢোক চিপে ফ্যাসফেসে গলায় বলল, আপনি মানুষ না। এটা আপনি কি বলতেছেন? নিশ্চয় আপনি আমার সাথে মজা করছেন, যদিও আপনার সাথে আমার মজা করার মতো সম্পর্ক না তারপরও এ কথা কিভাবে বিশ্বাস করি।

ভালোই অভিনয় জানে ফাউল মিয়া। সে পাকা অভিনেতার মতো অভিনয় করে যাচ্ছে। তার সুচারু অভিনয়ের কারণে ফাউল মিয়া পার পেয়ে যাচ্ছে।

ও আপনাদের বলে রাখি, আসিমোর সিস্টেমে একটু সমস্যা হয়েছে, তার সার্কিটে গণ্ডগোল হয়েছে। সে আগেভাগে সবকিছু বুঝতে পারলেও কিছুদিন হলো সে আগেভাগে কোনো কিছু বঝুতে পারছে না।

সে কারণে তার সমস্যা হচ্ছে। সে কথা বলার সময় ফাউল মিয়া কি ভাবছে তা সে বুঝতে পারছে না। সে হয়ে গেছে মানুষের মতো। তাকেও অনুমান করে বুঝতে হচ্ছে। সে ফাউল মিয়াকে বাজিয়ে দেখার জন্য সব সত্য বলে দেবে বলে ঠিক করেছে।

ফাউল মিয়া অবশ্য আসিমোর এই বিষয়টা জানত না যে, আসিমো আগেভাগেই সব বুঝতে পারে। এটা জানতে পারলে সে আরো সতর্ক থাকত নাকি সরলভাবে জীবনযাপন করতো তা ঠিক বোঝা যায় না। ফাউল মিয়া আসিমোর

সাথে কথা বলার সময় তাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। তা লক্ষ্য করেছে আসিমো মিথ্যে বলছে না, সত্যিই বলছে।

কিন্তু কেন সে সত্যি বলছে। তার সত্যি বলার কারণটাই বা কি? সে সত্যি না বললে কোনো অসুবিধা হতো না। এসবের পেছনে কোনো কারণ নেইতো? থাকলে তা কি? কোন বিষয়টা সামনে ঘটতে যাচ্ছে, যার কারণে আসিমো আজ তাকে সব তথ্য জানিয়ে দিচ্ছে।

আসিমো খানিকক্ষণ দম নিয়ে সে তার জীবনের সব ঘটনা ফাউল মিয়াকে বলল। জাপান থেকে তাকে কিনে আনা থেকে শুরু করে আজকের দিনের ঘটনা পর্যন্ত সব তথ্য। কেবল বলল না, ভ্যানিলা স্কাইয়ের কোডিংটা যে তার মাথার ভেতরে বসানো আছে-সেটা। দু'জনই একটা করে বিষয় গোপন করে গেল।

বিল গেটস ইদানীং দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে দিন পার করছেন। তার দুশ্চিন্তা আসিমোকে নিয়ে। তিনি তাকে নিয়ে ঠিক ভরসা পাচ্ছেন না। আসিমোর মাথার ভেতর যে কোড বসানো আছে সেটা যদি সে নষ্ট করে ফেলে। এ ব্যাপারটা নিয়েই তার যত দুশ্চিন্তা। যদিও আসিমো তা করবে না বলেই তার বিশ্বাস। কিন্তু ইদানীংকার দুয়েকটি ঘটনা তার মনে সন্দেহের বীজ বপন করেছে। সেদিন তিনি আসিমো আর ফাউল মিয়ার মধ্যকার কথা বার্তা শুনে ফেলেছেন।

বিল গেটসের ঘরে বড় পর্দায় তার নিজ অফিসের বিল্ডিংয়ের কোন কক্ষে কারা কাজ করছে, কি কাজ করেছ, কি কথা বলছে, কারা আসছে যাচ্ছে তা মনিটর করেন। কেবল আসিমোর কক্ষে কোনো সিসি টিভি নেই। ও ঘরে এটা কাজ করে না। ফাউল মিয়ার কক্ষে সিসিটিভির দেবার কোনো প্রয়োজন মনে করেননি তিনি।

তার বিশাল অফিস এলাকায় অফিস আছে ৪৮টি। তিনি সে ভবনে বসেন সেটার গুরুত্ব অনেক বেশি। নিরাপত্তার এবং গোপনীয়তার কারণে তিনি মাঝে মাঝে পর্দায় চোখ রাখেন। যদিও এসব মনিটর করার জন্য মানুষ আছে, তারপরও মাঝে মাঝে তিনি এসব বার কয়েকের জন্য দেখেন। বোঝার চেষ্টা করেন মানুষ সম্পর্কে।

সেদিন কাজের এক ফাঁকে তিনি আসিমোর রুমের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তাদের কিছু কথা শুনে ফেলেন। তিনি গিয়েছিলেন আসিমোর সাথে দেখা করতে। তিনি দেখেন আসিমো আর ফাউল মিয়া কথা বলছে। কি কথা বলছে সেটা তিনি শুনতে চাননি। তবে খেয়াল করেন, আসিমো স্মার্টলি কথা বলছে আর ফাউল মিয়া কাচুমাচু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

তার বারবার বলে হয়, আসিমো কেন ফাউল মিয়াকে এসব কথা বলতে গেলো। কি তো এসব না বললে। তবে তিনি একটা বিষয়ের কারণে তিনি খুশি যে

আসিমো ফাউল মিয়াকে ভ্যানিলা স্কাইয়ের কোডের কথা বলেনি। বলেনি যে তার মাথায় বসানো আছে এ কোডটি। তিনি ঠিক করলেন, ফাউল মিয়াকে ডেকে কথা বললে কেমন হয়। পিয়ন মানুষ, নিশ্চয় সে ডাকলে ফাউল মিয়া খুশি হবে।

ফাউল মিয়া তার রুমেই বসে আছে। কম্পিউটারে কি কাজ যেন করছে। কাজের প্রতি খুবই মনোযোগী সে। ফোন বাজছে, ফোনের রিংয়ের আওয়াজ তার কানে যাচ্ছে না। কাজ করতে করতে তার হঠাৎ মনে হলো ফোনের রিং বাজছে। ফোন ধরেই সে হ্যালো শব্দ শুনে চমকে উঠল। কার গলা বা কণ্ঠস্বর শুনছে সে। ভারি অথচ শান্ত গলা। বিল গেটস নিজের পরিচয় দিতেই সে ভীষণভাবে চমকে উঠল। মনে হলো সারা দুনিয়া এখন তার মাথার ওপর। ওপাশ থেকে ফাউল মিয়াকে বিল গেটসের রুমে যেতে বলা হলো। তারপর ফোনের রিংগারে বিপ বিপ শব্দ হতে লাগল। ফোন নামিয়ে রাখা হয়েছে।

ফাউল মিয়ার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, একি শুনছে সে। তাকে বিল গেটস তার রুমে ডেকে পাঠিয়েছে। তার কাছে এটা অনেক বড় ব্যাপার। সে ত্রস্ত পায়ে হেঁটে গেল বিল গেটসের কক্ষ পর্যন্ত। ওখান পর্যন্ত যেতেই তার শরীর বের ঘামের একটা ধারা নামতে লাগল। সে ভেতরে ভেতরে ক্রমাগত ঘেমেই যাচ্ছে। সে নিজে একটু ধাতস্থ হয়ে দরজায় টোকা দিল। গেটসের একজন ব্যক্তিগত সচিব আছে নিরো নামের। সে দরজা খুলে দিল। ফাউল মিয়া ভেতরে ঢুকেই একখানা চেয়ার অধিকার করল।

ফাউল মিয়া চুপচাপ বসে আছে। অকুল পাথার ভাবনায় সে আচ্ছন্ন। তাকে কেন ডাকা হয়েছে। কি কথা জিজ্ঞেস করবে তাকে। এমন সব ভাবনার মাঝেই তাকে জানানো হলো ভেতরে যাবার ডাক এসেছে।

ফাউল মিয়া বিল গেটসের অফিস কক্ষে এখন। সে সারা জীবন যাকে আদর্শ মেনে এসেছে, যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে সেই ব্যক্তি এখন তার সামনে বসা। ঘরে যে কত যে ডিজিটাল আসবাব আর কম্পিউটারের ঠাসা তা অন্য কেউ না দেখলে তাকে বলে বোঝানো যাবে না। ফাউল মিয়ার অবশ্য সেদিকে মনোযোগ নেই। তার সব মনোযোগ বিল গেটসে।

ঘরে ঢোকা মাত্র বিল গেটস ফাউল মিয়াকে বসতে বললেন। তারপর নোট বুকে বিশেষ কিছু তথ্য লিখে পিয়নকে ইশারা করল। পিয়ন দ্রুত দরজার ওপারে নিষ্ক্রান্ত হলো। বিল গেটস উঠে গিয়ে নিজের কামরার কফিবারে বসলেন। কফি মেশিন থেকে দু' কাপ কফি এনে এক কাপ মেলে ধরলেন ফাউল মিয়ার সামনে। ফাউল মিয়া মনে মনে একটু পুলকিত, আজ বিল গেটস তাকে নিজের হাতে বানিয়ে কফি খাওয়াচ্ছে। এর চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে।

কফি মগ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। ক্যাপাচিনো কফি। মগ উপচে পড়ছে ফেনায়। ফাউল মিয়া মগে চুমুক দেবে কি দেবে না ভাবছে। বিল গেটস বললেন—

নিন কফিতে চুমুক দেন। কফি বানানোতে আমার সুনাম আছে। আজ অব্দি কেউ খারাপ বলেনি। চুমুক দিয়ে দেখেন, আশা করি খারাপ লাগবে না।

ফাউল মিয়া ভয়ে ভয়ে কফিতে চুমুক দিল। বিল গেটস তার দিকে মুগ্ধতার চোখে তাকিয়ে আছে। ফাউল মিয়ার মনে শতেক প্রশ্ন। বিল গেটসের হঠাৎ এমন আচরণে সে বিস্মিত।

শুনুন, আপনাকে যে কারণে ডেকেছি। ফাউল মিয়া বিল গেটসের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। কথা শেষ হবার আগেই সে বলল, কেন ডেকেছেন?

আসিমোর সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?

ভালো। এক শব্দে উত্তর দিল ফাউল মিয়া।

ভালো হলেই ভালো। আপনি আসিমোকে এখন থেকে ফলো করবেন। ও কোথায় যায়, কি করে, কার কার সাথে মেশে, সব তথ্য আপনি আমাকে দেবেন।

কিন্তু ওকে তো ফলো করা মুশকিল। ও বুঝে ফেলবে।

বুঝবে না। আগে বুঝতে পারত। বুঝতে পারার সে ক্ষমতা ওর নষ্ট হয়ে গেছে। আমি খবর পেয়েছি মালয়েশিয়ার একটি আইটি কোম্পানি ওপেন হাউজ ওর পেছনে লোক লাগিয়েছে। বাংলাদেশে ওদের অফিস আছে। চেনেন নাকি আপনি ওদের?

এ প্রশ্নে কেমন যেন থতমতো খেল ফাউল মিয়া। এমন অবস্থা বিল গেটসের চোখ এড়িয়ে গেল। সে বেশ সপ্রতিভ গলায় বিল গেটসকে বলল—

না, এই কোম্পানির নাম শুনিনি।

ঠিক আছে নাম না শুনলেও কোনো সমস্যা নেই। ফলো করলেই হবে। আজ এখন থেকেই আপনি কাজে নেমে পড়ুন। আমার কথা শেষ।

ঠিক আছে স্যার, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব। ফাউল মিয়া রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

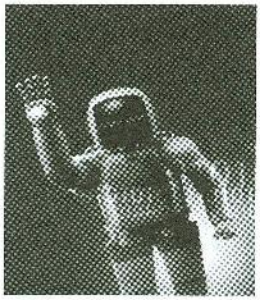

আহিরকে নাসির আলী তার রুমে ডেকে পাঠিয়েছে। আহির হাতের কাজ রেখে তার বসের সাথে দেখা করতে গেল। আহির দাঁড়িয়ে আছে তার বসের রুমের সামনে। ভেতর অন্বিতা বসা। অবস্থা দেখে মনে হলো ভেতরে খুব জরুরি মিটিং চলছে। সে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আহির ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কেন তাকে এই জরুরি তলব। হাতে তেমন জরুরি কোনো কাজও নেই। গেলো দিনই নতুন একটি এন্টিভাইরাস ছাড়া হয়েছে। আজ দুপুর পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে এন্টিভাইরাস খুবই ভালো চলছে। তাহলে কি আবার নতুন ভাইরাস তৈরি করতে হবে। বিষয়টা ভাবতেই তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই কাজটা সে করতে চায় না।

গত কয়েক মাসে সে তিনটা ভাইরাস তৈরি করে ইন্টারনেটে ছেড়েছে। ভাইরাসগুলোর মধ্যে একটি ছিল খুবই খারাপ প্রকৃতির। হ্যাকিং ডে নামের ওই ভাইরাস ব্যাপক তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিল। হাজারো কম্পিউটার নষ্ট হবার খবর এসেছিল তার কানে। কম্পিউটারে সেভ করা কত মানুষের তথ্য যে নষ্ট হয়েছিল তার কোনো হিসেব নেই। তবে বাকি দু'টি ভাইরাস খুব বেশি ক্ষতিকর ছিল না। সেগুলো ছিল মধ্যম মানের। ওইসব ঘটনার পর থেকে আহির খুব বেশি উৎসাহী ছিল না ভাইরাস তৈরিতে। তবে এন্টিভাইরাস তৈরিতে তার বিপুল উৎসাহ। আহির নাসির আলীর রুমের সামনে দাঁড়িয়ে এইসব মনে করছে তখন তার সম্বিত ফিরে এলো অন্বিতার ডাকে।

স্যার আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছে। অন্বিতা বলল।

আচ্ছা। আহির বলল। জানেন নাকি কিসের জন্য তলব করেছে?

জানি না। অন্বিতা ঠোঁট উল্টে বলল। এটুকু বলে অন্বিতা আর দাঁড়াল না। হনহন করে সে চলে গেল। অন্য সময় হলে আহির অন্বিতার গমন পথের দিকে দৃষ্টি বিছিয়ে দিত। আজ তা করল না। সে তার বসের রুমে ঢুকে গেল।

আহির সাহেব বসেন। বললেন নাসির আলী। নতুন কোনো খবর আছে নাকি?

না স্যার, সে রকম কোনো খবর নেই। শুনলাম এন্টিভাইরাসটা ভালো চলছে।

হ্যাঁ, সে রকমই তো শুনছি। এটা নিয়ে আমার অনেক আশা। এটা আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে আমার মনে হয়। আপনার কি ধারণা?

সত্যি বলতে কি, আমি এসব নিয়ে ভাবি না। আমি আমার কাজটা সম্পর্কে শতভাগ মনোযোগী থাকতে চাই। আপনি হয়তো তা খেয়াল করে থাকবেন।

আমি বুঝতে পারছি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন। নাসির আলী সহানুভূতির সুরে বললেন, ভাইরাস তৈরি করতে আপনার ভালো লাগে না জানি। কিন্তু আর করবেন। দুনিয়াটা এভাবেই চলছে। আমাদের তো টিকে থাকতে হবে। তবে আর যাই বলেন না কেন, ভাইরাস তৈরি করতে তো দক্ষতা লাগে। সে দক্ষতা যে আমাদের আছে আমরা তা প্রমাণ করেছি।

ওসব তো খারাপ পথে। ভালোভাবেও আমরা নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করতে পারি। ভাইরাস বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষরা তৈরি করুক। আমরা না হয় এন্টিভাইরাস তৈরি করলাম। এটা অনেক ভালো একটা কাজ। এন্টিভাইরাস তৈরি করে আমরা বিশ্বকে জানান দিতে পারি বাংলাদেশ এ বিষয়ে মোটেও পিছিয়ে নেই।

শুধু অন্যের ওপর নির্ভর করে বড় হওয়া যায় না। কে কি ভাইরাস তৈরি করছে এমন তথ্য আমাদের কাছে আগাম আসে না। খবর আসে তবে তা ভাইরাস আক্রমণ করলে। আগেভাগে জানলে আমরা তা তৈরি করতে পারতাম। এ কারণে ব্যবসার তাগিদে আমাদের ভাইরাস তৈরি করতে হয়। এটাওতো সুখের কথা যে আমরা ক্ষতিকর জিনিস তৈরি করেলও প্রতিষেধক কিন্তু আমরাই তৈরি করছি।

মন্দের ভালো এই যে, আমরা ভাইরাস তৈরি করে ইন্টারনেটে ছাড়ার আগেই তা জানিয়ে ইন্টারনেটে তথ্য ছাড়ি। এ কারণে অনেকে সতর্ক থাকে। ক্ষতির মাত্রা কম হয়।

এটা অবশ্য আপনি ঠিক বলেছেন। নাসির আলীর মন্তব্য।

স্যার, আমি একটা বিষয় ভেবেছি।

কি? নাসির আলী প্রশ্ন করলেন।

আমি ঠিক করেছি আমি এমন একটি এন্টিভাইরাস তৈরি করব যে এন্টিভাইরাস কম্পিউটারে ব্যবহার করলে আর কখনোই কম্পিউটার ভাইরাস আক্রমণ করবে না। এটা এমন একটি এন্টি-ভাইরাস হবে যার জন্য কোনো ভাইরাস লিখতে হবে না।

কি বল তুমি? এটাতো খুবই আনন্দের কথা। নাসির আলী উচ্ছ্বসিত। কিভাবে এটা সম্ভব?

সম্ভব স্যার। আমি সব ভেবে রেখেছি। কেবল শুধু আপনার সহযোগিতা চাই। আহির বলল।

আপনার যে কোনো ধরনের সাহায্যের জন্য আমাকে পাবেন। কখন কি করতে হবে শুধু একবার বলবেন। দেখবেন এক নিমিষেই পেয়ে গেছেন।

ধন্যবাদ স্যার। আহিরের খুশি খুশি মুখ।

তবে যে কারণে আমি আপনাকে ডেকেছিলাম, এই খুশির সংবাদে তা বলতে ভুলে গেছি।

স্যরি স্যার। আমার বোঝা উচিত ছিল।

আরে না না, ঠিক আছে। এটাওতো অনেক বড় খুশির খবর। আপনি যদি এমন এন্টি-ভাইরাস তৈরি করেন তাহলে আমি আমার ব্যবসার পরিকল্পনা বদলে ফেলব। এখন যে বিষয়টা আপনাকে বলব বলে ডেকেছি সেটা শুনলেও আপনি বুঝবেন আমি ব্যবসা নিয়ে ইতিবাচক ভাবনা ভাবতে শুরু করেছি।

স্যার আপনি বলুন। আহির নাসির আলীর কাছ থেকে কথাটা শুনতে উদগ্রীব।

আপনি ভ্যানিলা স্কাই অপারেটিং সিস্টেমটা ভালো করে পরীক্ষা করবেন তো। প্রয়োজন হলে পাসওয়ার্ড ভাঙবেন।

নাসির আলীর কথা শুনে আহির ভ্রু কুঁচকালো। নাসির আলী তা খেয়াল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন—

আরে না না, বিষয়টা নেগেটিভলি নেবেন না। আপনাকে যা বললাম তা করুন। একটা ভালো কিছু পেলেও পেতে পারেন। ওই বললাম, আমি আমার ব্যবসায়ের কৌশল বদলাতে চাচ্ছি।

স্যার কি আমাকে খুলে বলবেন আপনি আসলে কি মিন করতে চাইছেন।

শুনুন, আমি একটি বিশেষ তথ্য পেয়েছি যে ভ্যানিলা স্কাই দিয়ে বিশ্বের সব কম্পিউটার অচল করে ফেলা হবে। যেভাবেই হোক আমরা এটা রুখতে চাই। কিভাবে সব কম্পিউটার অচল করা হবে সেটা জানতে পারিনি। শুধু এটুকু শুনে রাখুন, গতকাল সকালে ল্যান্ডফোনে কথা বলতে গিয়ে ক্রস কানেকশনে আমি এ তথ্যটা পেয়েছি। সত্যি মিথ্যা জানি না। আপনাকে উদ্ধার করতে হবে ঘটনাটা কি?

ফোনে ক্রস কানেকশনের ফলে যতটুকু বুঝতে পেরেছি, আর তা হলো যে ফোন করে এ তথ্যটা দিচ্ছিল সে বিদেশে থাকে। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ক্রস কানেকশন হয়। ও প্রান্ত থেকে বলছিল ওখানে এখন প্রায় ম্যধরাত। তথ্য এটুকু। এখন বাকিটা আপনার হাতে।

ঘটনা শুনতে শুনতে আহির ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজনা বোধ করছে। বলল,

স্যার দেখি চেষ্টা করে। হয়তো পারতেও পারি রহস্যটা কি উদ্ধার করতে। স্যার আমি তাহলে আজ উঠি।

ঠিক আছে। আপনি আসুন। এন্টি-ভাইরাস তৈরির পাশাপাশি ভ্যানিলা স্কাইয়ের কথাটা মাথায় রাখবেন।

ফাউল মিয়া আজ অফিসের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হলেও অফিসে যায়নি। রাস্তার মোড়ে গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছে। আজ আসিমো বের হবে। কার সাথে সাথে যেন দেখা করবে। গতকাল ফাউল মিয়া আসিমোকে একটা কাগজ দিতে গেলে দেখে সে ফোনে কথা বলছে। কথা বলার সময় সে শুনে ফেলে আজ সকাল ১০টায় কার সাথে যেন দেখা করবে আসিমো। সাথে সাথে তার মনে পড়ল তার বাড়তি দায়িত্বের কথা। সুযোগ মিস করা যাবে না। সে একারণে আজ অফিসে না গিয়ে অপেক্ষা করছে রাস্তায়। সাড়ে নয়টার চেয়ে কিছু বেশি বাজে এখন। উত্তেজনার বশে ফাউল মিয়া আজ একটু আগেই বেরিয়ে পড়েছে। তাই তার অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর উপায় কি।

১৫ মিনিট পার হয়েছে। হিম শীতল গাড়ির ভেতরে বসে থাকতে থাকতে ফাউল মিয়ার চোখ ধরে আসছে। তার বেশ কসরত করতে হচ্ছে চোখ খোলা রাখতে। সে যখন এইসব করছে তখনই তার চোখে পড়ল আসিমোর লাল রঙের লিমোজিনটা। ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে গাড়িটা। সারা আমেরিকায় নাকি লাল রঙের লিমোজিন মাত্র ১০টি। আসিমোরটা তার মধ্যে একটি।

ফাউল মিয়া নড়েচড়ে বসে গাড়ি স্টার্ট দিল। গাড়ি স্টার্ট হলেও গাড়ি নড়ছে না। আসিমোর গাড়ি ফাউল মিয়ার গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যেতেই নড়ে উঠল ফাউল মিয়ার গাড়ি। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলছে দু'টো গাড়ি। ফাউল মিয়ার ধূর্ত চোখ ফাঁকি যেতে পারছে না আসিমোর গাড়িটা, চলছে গাড়ি সমান তালে। আসিমো বুঝতে পারছে না তার পেছনে টিকটিকি লেগেছে। সে তার স্টাইলে গাড়ি চালাচ্ছে। একবারও পেছন ফিরে তাকানোর প্রয়োজন মনে করছে না। যদিও ব্যাকভিউ মিররে চোখ পড়লে পেছনের দৃশ্য দেখা যায়। পেছন ফিরলেই কিন্তু তার চোখে পড়ে ফাউল মিয়ার গাড়ি। আসিমো একবারও পেছনে ফিরল না।

প্রায় ঘণ্টাদুয়েক পরে আসিমোর গাড়ি থামল হাডসন নদীর তীরে। গাড়ি থেকে

নেমেই আসিমো চলে গেলে শান বাধানো আসনের দিকে। ফাউল মিয়া অদূরে গাড়ি পার্ক করে আসিমোকে ফলো করতে লাগল। আসিমো শান বাঁধানো একটি বেঞ্চিতে বসল। ফাউল মিয়াও দূরত্ব বজায় রেখে একটা বেঞ্চিতে বসেছে।

বেশ কিছুক্ষণ হয় আসিমো বসে আছে। তার দৃষ্টি হাডসন নদীর পানিতে বিছানো। কোনো নড়াচড়াও সে করছে না। পকেট হাতড়ে মোবাইল বের করে কার সাথে যেন কথা বলল। কথা শেষ হবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একজন মোটাসোটা আমেরিকান এসে বসল আসিমোর পাশে। তার মাথা কামানো। চকচক করছে। বোধহয় লোকটা প্রতিদিন মাথা কামায়। আসিমোর পাশে বসে ওই মোটাসোটা আমেরিকান হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে। আসিমো তেমন কোনো কথা বলছে না। সে কেবল শুনছে।

ফাউল মিয়া খেয়াল করল ওই টাক্কু লোকটা আসিমোর মাথায় হাত দিচ্ছে। হ্যাঁ, তাইতো লোকটা আসিমোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আসিমো বার কয়েক মাথা নিচু করল। টাক্কু লোকটা কি যেন দেখল আসিমোর মাথায়। দেখা শেষ হলে আবারো হাত বুলিয়ে দিল। ফাউল মিয়ার মনে ভাবনার উদয় হলো, 'আসিমো একজন রোবট মানব, তাহলে লোকটা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কেন? হাত বুলালে তোর আসিমোর আরাম হবে না। তাহলে কেন এটা করা হচ্ছে? নিশ্চয় এর পেছনে কোনো মতলব আছে।' এভাবে কিছুক্ষণ চলার পরে আসিমো আর ওই টাক্কু লোকটা উঠে দাঁড়ালো। ফাউল মিয়ার আর দেরি করল না। সেও উঠে দাঁড়ালো। টাক্কু লোকটা আসিমোর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে।

আসিমো তার ঝাঁ চকচকে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সাঁই করে বেরিয়ে গেল। ফাউল মিয়াও ওর পিছু নিল কিন্তু আসিমোর গাড়ির গতির সাথে পেরে উঠল না। একটু পথ যেতেই আসিমোর গাড়ি হারিয়ে ফেলল সে। মনটা খারাপ হলো তার। তীরে এসে তরী ডুববে না তো। আসিমো কি অফিসে যাবে নাকি অন্য কোথাও যাবে— মনে মনে ভাবছে ফাউল মিয়া।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে ফাউল মিয়া অফিসে পৌছল। অফিসে পৌছেই শুনতে পেল তার ডাক এসেছিল। আসিমো তার খোঁজ করেছে দু'বার। ফাউল মিয়া আসিমোর ঘর ঘুরে এসেছে। তেমন জরুরি ডাক নয়। কিছু কাগজপত্র চেয়ে পাঠিয়েছে। ফাউল মিয়া গিয়ে ওগুলো দিয়ে এসেছে। সে যে কিছুক্ষণ আগে আসিমোর সাথে ইঁদুর বিড়াল খেলেছে সে কোনোভাবেই তার আচরণে প্রকাশ পেল না, মানে ফাউল মিয়া প্রকাশ হতে দিল না।

ফাউল মিয়া তক্কে আছে কখন আসিমো বের হবে। সে তার ঘরে পায়চারি করছে। আসিমোর শিডিউল ফাউল মিয়ারই তৈরি। সে মোতাবেক বেলা ২টার সময় তার একটা মিটিং আছে। এখন বাজে বেলা দেড়টা। আর আধ ঘণ্টা সময়

আছে আসিমোর হাতে। এখন বের না হলে মিটিং ধরতে সমস্যা হবে আসিমোর। ফাউল মিয়া আর টেনশন ধরে রাখতে পারছে না। থাকতে না পেরে সে হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়াল তার বস আসিমোর রুমের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ভেসে এলো আসিমোর ডাক...

ভেতরে আসুন। আসিমো ফাউল মিয়াকে ডাকছে।

স্যার, আপনার মিটিং দু'টোয়। সেটা জানাতে এসেছি। এখন দেড়টা বাজে।

মনে আছে আমার। মিটিংয়ের জন্য তৈরি হচ্ছি। কাগজপত্র সব গোছগাছ করছি। ও হ্যাঁ, ভালো কথা। আমার সাথে মিটিংয়ে তোমার যাবার দরকার নেই। তুমি বরং ঘরটা গুছিয়ে রাখ। কাগজ পত্রগুলো সব এলোমেলো হয়ে আছে।

ফাউল মিয়া যেন এ কথার অপেক্ষাতেই ছিল। সে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল। মাথা নাড়ার মানে, সে এ ঘরেই থাকবে। কাগজ পত্রগুছিয়ে নিয়ে আসিমো মিটিংয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল। ফাউল মিয়া একবার সবকিছু দেখে নিয়ে অফিস ঘর গুছাচ্ছে। একটা দু'টো করে সে জিনিসপত্র গুছিয়ে জায়গা মতো রাখছে। কিন্তু এ কাজে তার মন নেই। তার মনে বাসা বেঁধেছে সন্দেহ। সে সন্দেহ দূর করার জন্য একটা জিনিস তালাশ করতে শুরু করল।

ফাউল মিয়ার নজর টেবিলের ড্রয়ারের দিকে। আজো ড্রয়ারে চাবি ঝুলছে। আসিমো বের হবার সময় নিতে ভুলে গেছে। মাইক্রোসফটের সবাই অটোমেটেড ড্রয়ার ব্যবহার করে। ব্যতিক্রম কেবল আসিমো। সে ম্যানুয়াল ড্রয়ার ব্যবহার করে। অটোমেটেড ড্রয়ারে কোড দিয়ে খুলতে হয়। আসিমোর ড্রয়ার খুলতে চাবি লাগে। আজ অবশ্য ফাউল মিয়ার চাবি লাগল না। সে টেনে ড্রয়ার খুলে বের করল। ড্রয়ার আজ একেবারে খালি, কিছুই নেই বলতে গেলে।

আছে কেবল একটি এক পৃষ্ঠার টাইপ করা কাগজ। কাগজ দেখে কিছুই বুঝতে পারছে না সে। আচ্ছা বোঝাবুঝি, পরে আগে এটাকে কপি করে নিই। নিজেকে সে নিজেই কাজ করার তাগিদ দিল। সে আসিমোর কক্ষে রাখা ফটোকপি মেশিন দিয়ে একটা কপি করে নিল। মূল কাগজটা ফের ড্রয়ারে রেখে দিয়ে ফাউল মিয়া নিজের কাজে মন দিল। কাজ শেষ হতে তার লাগল আধঘণ্টা।

ফাউল মিয়া তার রুমে বসে আছে। কাজবিহীন বসে আছে তা নয়। তার চোখের সামনে ফটোকপিটা ধরা। সংকেত জাতীয় কি সব হিজিবিজি লেখা। সে কিছুই উদ্ধার করতে পারছে না। একটা সংকেতে এসে তার চোখ আটকে গেল। টেবিলে রাখা পেনহোল্ডার থেকে একটা লাল কলম নিয়ে সে ওই বিশেষ সংকেতটাকে গোল চিহ্ন দিয়ে রাখল। সে মনে মনে ঠিক করল, এখন তার মূল কাজ এই সংকেতটা কি এবং কিসের জন্য তা উদ্ধার করা।

আহির তার বসের দেয়া কাজটা শুরু করেছে। অফিসে নিজের কক্ষে বসে সে ভ্যানিলা স্কাইয়ের ত্রুটি বের করতে ব্যস্ত। অন্য কোনো কাজে তার মন নেই। একটাই তার ধ্যান-জ্ঞান, তাকে ভ্যানিলা স্কাইয়ে কি ধরনের ত্রুটি আছে বের করতে হবে।

এরই মধ্যে সে বার কয়েক দেখেছে যে, ভ্যানিলা স্কাইয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুরক্ষিত। কোনোভাবে এটার কিছু করা সম্ভব নয়। 'নাহ, বিষয়টা যত সহজ মনে করা গিয়েছিল, এতোটা সহজ নয়। অনেক খাটতে হবে।' স্বগোতোক্তি করল আহির।

তিনদিন পরের এক দুপুরের কথা। আহির কাজটা নিয়ে খুবই ব্যস্ত সময় পার করছে। আজ বিকেলের মধ্যে আহির বুঝতে পারবে, সে কখন কাজটা করবে মানে আহির তার কাজের একদম শেষভাগে চলে এসেছে। এখন কি অবস্থা সে কাউকে কিছু বলতে চায় না। নাসির আলীও বার কয়েক তার কাছে জানতে চেয়েছে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে। কিন্তু সে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। নাসির আলী এতোদিনে বুঝে গেছেন আহিরের স্বভাব, প্রকৃতি। তাকে তিনিও আর ঘাঁটেননি। তিনি জানেন সময় হলে আহির তাকে জানাবে। তবে আজ তিনি বিচলিত বোধ করছেন, কাজটা শেষ পর্যন্ত আহির করতে পারবে কিনা এই ভেবে।

এরই মাঝে অন্বিতা দু'বার এসে তার খোঁজ নিয়ে গেছে। নাসির আলী আহিরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আহিরের হাতে সময় নেই যাবার মতো। সে অন্বিতাকে জানিয়ে দিয়েছে হাতের কাজটা শেষ হলেই যাবে। অন্বিতা আর কোনো কথা বাড়ায়নি।

শেষ বিকেলে গোধূলি লগ্নে আহিরের মুখে হাসি ফুটে উঠল, সে হাসি বেশিক্ষণ থাকল না। সে পেরেছে তার সাধনাকে সফল করতে। সে ভেঙে ফেলেছে ভ্যানিলা স্কাইয়ের কোড। ভ্যানিলা স্কাইয়ের কোড ভেঙে আহিরের মুখটা শুকিয়ে গেল। আনন্দে ঝলমল করে উঠল নাসির আলীর মুখ। খুশিতে তিনি আত্মহারা। আনন্দে

নাচতে লাগলেন তিনি। তার ওই কেতু নাচন দেখে অফিসের অন্যরা লজ্জায় মুখ লুকালো। কেউ কেউ আবার ফিচেল হাসিও দিল। আহিরের মুখে কোনো কথা নেই। সে একি দেখছে। তাবৎ বিশ্বের কম্পিউটার অচল করে দেবার একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে কোড দেয়া। লেখা আছে কবে পৃথিবীর সব কম্পিউটার ধ্বংস করা হবে।

সন্ধ্যার পরে নাসির আলীর রুমে জরুরি মিটিং বসেছে। মিটিংয়ের সদস্য সংখ্যা মাত্র চারজন। নাসির আলী, অন্বিতা, আহির আর থার্ড আইয়ের এক্সটার্নাল বিভাগের হেড বশির হাম্মাদ। মিটিং রুমে গুরুগম্ভীর পরিবেশ। নাসির আলী এতোক্ষণ সব কথা বলেছেন, শুনেছে সবাই। এখন বলার পালা আহিরের। অনেক্ষণ হয় সে কিছু বলছে না। চুপ করে আছে। মুখটা ভীষণ অন্ধকার করে রেখেছে সে। নাসির আলী তার মোটা কাঁচের চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছেন আহিরের পানে। ছোটখাট শরীরের বশির হাম্মাদ শকুনের মতো গলা উঁচিয়ে বসে আছেন। দৃষ্টি আহিরের ওপর। এই লোকটাকে আবার আহিরের ভীষণ অপছন্দ। কেউ কিছু বলছে না দেখে মুখ খুললেন নাসির আলী...

আহির চুপ করে থাকবেন না। এতো বড় একটা কাজের অর্ধেক পর্যন্ত এসে কেন না করছেন?

স্যার, কাজটা আমি করতে পারব না।

আমি জানি আপনি পারবেন। বেশ শান্ত গলায় বললেন নাসির আলী। বেশি মানুষ হলে ব্যাপারটা ভেস্তে যাবে। আমি চাই না এই চারজন ছাড়া ব্যাপারটা অন্য কেউ জানুক। সারা বিশ্বের মানুষের জন্য আপনি এ কাজটা করতে পারবেন না?

এটা করলে আমাদের কোম্পানি কিভাবে লাভবান হবে? মনে মনে সে খানিকটা বিরক্ত।

শুনুন, এটা করতে পারলে চারদিকে খবর হয়ে যাবে, কাজটা কারা করেছে। সবাই জানলে তাতে আমাদেরই লাভ। এতে কোম্পানির সুনাম বাড়বে। এটাই হবে আবার আমাদের ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মূল হাতিয়ার। বুঝতে পারলেন?

হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম। আহির বার কয়েক মাথা ঝাঁকালো।

তাহলে আজই কাজ শুরু করে দেন। দেরি করে লাভ কি?

ঠিক আছে বলে আহির রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। সবাই তার যাবার পথের দিকে চেয়ে রইল। অন্য সময় হলে সবাই ব্যাপারটা নিয়ে ফুসফাঁস করত। এখন কেউ করল না। নাসির আলী পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য বললেন, মেধাবীরা একটু এমনই হয়। এটা দোষের কিছু না। বশির হাম্মাদ চশমা খুলতে খুলতে বললেন, তা ঠিক তা ঠিক।

আহির তার রুমে ফিরে কি মনে করে ফোনটা হাতে তুলে নিল। খানিকক্ষণ

সেটা হাতে ধরে রেখে ফোন সেটটা আবার নামিয়ে রাখল। ফাউল মিয়াকে ফোন করতে গিয়েও করল না। 'না না, এখন করা যাবে না। এখনতো আমেরিকায় অনেক রাত। এতক্ষণে নিশ্চয় ও ঘুমিয়ে গেছে।' বাসায় ফিরে রাত ৯টার দিকে সে ফোন করবে বলে ঠিক করল। তখন পেট ভরে কথা বলা যাবে। আহির ফোনটা টেবিলে রাখল।

রাত সাড়ে ৯টা। বাংলাদেশ সময়। আমেরিকায় বাজে সকাল সাড়ে এগারোটা। আহির ফোন দিল ফাউল মিয়াকে। দু'টো রিং বাজার সাথে সাথে সে ফোন ধরল। ওপাশে হ্যালো বলে বলল, ফাতাউল বলছি।

আরে আমি, আমি। আহির। তোর তো বেশ ভালো উন্নতি হয়েছে রে। ফোন ধরেই ফাউল মিয়া থুক্কু ফাতাউল বলছি বলা শুনে বলি, বাপরে আমাদের ফাউল মিয়ার এতো উন্নতি।

তা দোস্ত তুমি কি মনে কইরা ফোন দিলা। তোমার তো টেকা খরচা হইতেছে। কোনো কথা নাই বার্তা নাই। একেবারে ফোন করলা? তুমিতো এই জাতের না।

এমনি দোস্ত, কোনো কারণ নাই। কোনো কারণ ছাড়াই তোরে ফোন দিলাম তবে একটা খবর আছে।

কি খবর দোস্ত?

আমি ভ্যানিলা স্কাইয়ের কোডটা ভাঙতে পেরেছি। ওটা ভেঙে অনেক তথ্য পেয়েছি। আমি নিশ্চিত সারাবিশ্বের লোকজন এটার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশ্বের মানুষ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য আমি একটা কাজ করতে চাই।

আহির যখন এ কথাগুলো বলছে তখন ফাউল মিয়া তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, সে এ কথা যেন আর কাউকে না বলে। কে শোনে কার কথা। আহির জানত ফাউল মিয়া এরক বলতে পারে। সেও তার মতো করে কথা গুছিয়ে রেখেছে।

ফাউল মিয়া অস্থির অস্থির করছে। সে হঠাৎই চঞ্চল হয়ে উঠল। তার চঞ্চলতা আহির দেখতে পারছে না। তবে অনুভব করতে পারছে, সে সাংঘাতিক একটা কিছু করে ফেলেছে। ফাউল মিয়া তাড়াতাড়ি ফোন রেখে দিতে চাইল। আহিরও বেশি জোর করল না। সে যা বোঝার বুঝে গেছে।

আহিরের কাছ থেকে খবরটা জানার পর ফাউল মিয়া যেন কেমন হয়ে গেছে। চুপচাপ থাকে বেশিরভাগ সময়, কথা কম বলে। কারোর সাতেও নেই, পাচেও নেই। সে জানতে পেরেছে আহির যদি এই কাজটা মানে বিল গেটসের জারিজুরি রুখে দিতে পারে তাহলে ওর বস ওকে ১ লাখ ডলার পুরস্কার দেবে। যদিও বাংলাদেশ থেকে তার বস তাকে মেসেজ পাঠিয়েছে, সে যদি আহিরের হাত থেকে পাসওয়ার্ডকে রক্ষা করাতে পারে তাহলে তার বসও তাকে ১ লাখ ডলার পুরস্কার দেবে।

ফাউল মিয়ার বস স্যামুয়েল মল্লিক তাকে এই মিশনে পাঠিয়েছে, তার কাজ আসিমোর কাছ থেকে পাসওয়ার্ড উদ্ধার করা। এটা করে তার বসকে দিলে তাকেও ওই পরিমাণ টাকা পুরস্কার দেবে। স্যামুয়েল মল্লিক কিছুদিন আগ পর্যন্ত মাইক্রোসফটে চাকরি করেছে। বিল গেটসের খুবই বিশ্বস্ত লোক ছিল সে। বিল গেটসের এই প্রজেক্টের গোপন কথা তিনিও জানেন।

আসিমোর ল্যাপটপে বিল গেটসের পরিকল্পনার কথা টেক্সট আকারে রাখা ছিল। স্যামুয়েল

মল্লিক একদিন ব্লু-টুথের মাধ্যমে ওই তথ্য তার মোবাইল ডিভাইসে কপি করে নেয়। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে মাইক্রোসফটে সে ইস্তফা দিয়ে বসে।

মাইক্রোসফটে ইস্তফা দিলেও স্যামুয়েল মল্লিক বাংলাদেশ মাইক্রোসফটের লাইসেন্সড সফটওয়্যার বিক্রির জন্য অনুমোদন নিয়ে আসে। চাকরি না করে যেন ব্যবসায় করে টিকে থাকা যায়। স্যামুয়েল মল্লিক একদিকে যেমন চুটিয়ে ব্যবসা করছেন অন্য দিকে বিল গেটসকে ব্ল্যাক মেইল করার জন্য চাকরি দিয়ে পাঠিয়েছে ফাউল মিয়াকে। তার উদ্দেশ্য বিল গেটসকে ব্ল্যাক মেইল করে বড় অঙ্কের দান মারা। আপনারা ভাবছেন মাইক্রোসফটে চাকরি পাওয়া এতো সহজ। তাও আবার

ফাউল মিয়ার মতো অযোগ্য মানুষের চাকরি পাওয়া বলে কথা। তাহলে এবার সে ঘটনাটাই বলি।

মাইক্রোসফটের যখন ভীষণ দুর্দিন তখন বিল গেটস প্রচুর কর্মী ছাটাই করে। সে সময় অনেককে ছাটাই করলেও স্যামুয়েল মল্লিককে করেননি তিনি। হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন কর্মী ছিল তার সাথে। বিল গেটস সেই দুর্দিনে তাদের বেতনও দিতে পারতেন না। স্যামুয়েল মল্লিকের অনেক বেতন জমা হয়ে যায় মাইক্রোসফটে।

স্যামুয়েল মল্লিক একটি বিভাগের চিফ অপারেটিং অফিসার থাকায় তার বেতনও ছিল বেশি। বিল গেটস দিনে দিনে দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে পড়েন। স্যামুয়েল মল্লিক এসব দেখে আর বেতন চাইতেন না। চাইলেইবা বিল গেটস কোথা থেকে দেবেন। বিল গেটসও তাকে ছাড়তে পারছেন না। কিভাবে ছাড়াবেন। এতোদিনের বিশ্বস্ত একজন মানুষ।

বিল গেটস বাংলাদেশকে অনেক ভালো জানেন একমাত্র স্যামুয়েল মল্লিকের কারণে। তার সততা, পরিশ্রমের কারণে একজন সাধারণ প্রোগ্রামার থেকে চিফ অপারেটিং অফিসার হতে তার খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। এ কারণে তিনি বিল গেটসের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। এ সবকিছুর জন্য তিনি তার বাকি পড়া বেতন চাইতেন না। এক সময় যখন দেখলেন, আর চলছে না। তার অন্য কিছু করা উচিত তখন একদিন তিনি বিল গেটসকে তার অপারগতার কথা জানান। অবশ্য তার আগেই স্যামুয়েল মল্লিক বিল গেটসের গোপন পরিকল্পনার কথা জেনে গেছেন।

স্যামুয়েল মল্লিক চলে যাবার সময় বিল গেটস বলেন, কোনোদিন যদি তার সুদিন ফেরে তাহলে তিনি তার সব পাওনা মুনাফাসহ ফিরিয়ে দেবেন। এছাড়া যদি তার আরও কিছু চাওয়ার থাকে তাহলে তিনি তাও পূরণের আশ্বাস দেন। স্যামুয়েল মল্লিক শুধু বলেছিলেন,

আমার কোনো কিছু লাগলে আমি নিজেই আপনার কাছে চাইব। আপনি তখন না করতে পারবেন না।

আপনি বলবেন আর আমি তা পূরণ করব না তা কি করে হয়। তবে তার আগে আমাকে আগের অবস্থা ফিরে ফিরে আসতে হবে। বিল গেটস স্মিত হেসে বললেন।

সে রকম কোনো সম্ভাবনা কি আছে স্যার? কথাটা বলেই স্যামুয়েল মল্লিক একটু বাঁকা চোখে তাকালেন বিল গেটসের দিকে। বিল গেটসের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। বিল গেটস কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। চেহারায় একটা শান্ত ভাব এনে যতটা সম্ভব তিনি ধীরস্থির থাকলেন। তিনিও আঁচ করার চেষ্টা করছেন, স্যামুয়েল মল্লিক কি কিছু বুঝে ফেলল? না না, সেটা কিভাবে সম্ভব। আসিমো জীবনেও এ

তথ্য ফাঁস করবে না। যখন প্রয়োজন তখন কেবল সে তাকেই এ তথ্য জানাবে। এসব ভাবনা মনে এনে তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন।

দেশে ফিরে কিছুকাল যেতে না যেতেই স্যামুয়েল মল্লিক বুঝে গেলেন বিল গেটসের সুদিন ফিরতে শুরু করেছে। একদিন সুযোগ বুঝে তিনি ফোন করেন বিল গেটসকে। ফোন রিসিভ করে বিল গেটস হাসতে হাসতে বললেন...

বুঝতে পেরেছি আপনি কেন ফোন করেছেন। অ্যাকাউন্টেন্ট আপনার হিসাবপত্র গুছিয়ে রেখেছেন। আজকালকের মধ্যেই তিনি আপনার পাওনা টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংক হিসাবে পাঠিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

আপনিতো একদমে কথা বলে গেলেন। আমাকে বলার কোনো সুযোগই দিচ্ছেন না।

বিল গেটস হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক আছে, বলুন।

কি আর বলব। যা জানার ছিল তার সবই আপনি বলে দিয়েছেন। নতুন করে কিছু বলার নেই।

আর একটা ব্যাপার, আপনি একটা বিষয় আমাকে বলেছিলেন বলবেন। আপনার কি সে কথা বলার সময় হয়েছে? আর আপনার ব্যবসা কেমন চলছে? বিল গেটস প্রশ্ন করলেন।

না স্যার, সেটা সময় হলেই আমি বলব। আর ব্যবসা ভালোই চলছে।

ঠিক আছে ভালো থাকবেন। মাইক্রোসফটের দরজা সব সময় আপনার জন্য খোলা। যদি কখনো মনে করেন আপনি আবারো মাইক্রোসফটে ফিরতে চান তাহলে খুশি হব। বিল গেটস ফোনের লাইন কেটে দিলেন।

মাসতিনেক পরেই স্যামুয়েল মল্লিক আবার ফোন করলেন বিল গেটসকে। এবার তিনি ফাউল মিয়ার জন্য চাকরি চাইলেন। বিল গেটস কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করে বললেন,

আপনি আজই ওর সব তথ্য আমাকে মেইল করে দিন। ধরে নিন ওর চাকরি হয়ে গেছে। আপনি ওই ছেলেকে পরশু আপনাদের দেশের অ্যাম্বেসিতে যেতে বলেন। ভিসা হয়ে যাবে। স্যামুয়েল মল্লিক ভাবেননি এতো জলদি ফাউল মিয়ার চাকরি হয়ে যাবে।

এর পরের খবরতো সবার জানা। ফাউল মিয়া মাইক্রোসফটে চাকরি নিয়ে আমেরিকায়।

ফাউল মিয়া খবরটা জানার পর তার মনে দুশ্চিন্তা ভর করেছে। তার কি হবে। আহির যদি ভাঙা পাসওয়ার্ড থেকে জেনে যায় ভ্যানিলা স্কাইয়ের গোপন কোড ও

তারিখ কোথায় রাখা। তাহলে? এ ভাবনায় সে যখন জর্জরিত তখনই তার মাথায় একটা কুবুদ্ধি চাপল। কুবুদ্ধিটা মাথায় আসাতে একা একা হাসতে লাগল ফাউল মিয়া। তার কুবুদ্ধি অনুবাদ করলে দাঁড়ায় এরকম, ফাউল মিয়া রোবট আসিমোকে চুরি করবে।

ফাউল মিয়া জানে না, কিভাবে সম্ভব প্রায় অসম্ভব এই কাজ করা। কিন্তু তাকে কাজটা করতে হবে। হাতে সময় নেই একদম। সে কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ল। কাজটা কিভাবে করবে তার একটা ছক আঁকতে হবে তাকে।

কাগজ কলম নিয়ে সে আঁকিবুকি আঁকছে। সময় সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত। মাথায় কোনো সমাধান আসছে না ফাউল মিয়ার। ধীরে ধীরে ফাউল মিয়ার মধ্যে অস্থিরতা ভর করছে। তার মুখের এক্সপ্রেশন বদলে যাচ্ছে। তার কপাল কুঁচকে আছে। চুলগুলো অবিন্যস্ত। এই শীতের দিনেও তার জুলফি বেয়ে চিকন ঘাম নামছে। ফাউল মিয়ার গলা শুকিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চলের মাঠের মতো। সে টেবিল থেকে পানির বোতল নিয়ে মুখের ওপর উপুড় করে গলায় চালান করে দিল। ঢক ঢক করে পানি খেয়েও তার পিপাসা মেটে না। দুশ্চিন্তায় তার মাথার শিরাগুলো দপদপ করছে। ঘাড়ে হালকা ব্যথাও অনুভূত হচ্ছে তার।

ফাউল মিয়া বেদিশা হয়ে বাথরুমে ঢুকল। পানির কল খুলে মাথায় পানি দেবার আগ মুহূর্তে তার চোখে পড়ল একটা তেলাপোকা। এই মার্কিন মুলুকে তেলাপোকা। ফাউল মিয়া অবাক হলো। তেলাপোকাটা মরা। বাথরুমের মেঝেয় মরে পড়ে আছে। তেলাপোকা মরা হোক আর জীবন্ত হোক তাতে ফাউল মিয়ার কিছু যায় আসে না। সে তেলাপোকা ভয় পায় না। সে ও নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। তার এখন মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা।

ফাউল মিয়া মাথায় অনেকক্ষণ ধরে পানি ঢালছে। তার মাথা দপদপ কমছে না। ঘাড়ে পানি পড়ায় তার বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। বাথরুম থেকে বের হবার সময় সময় সে বাইরে ফেলার জন্য তেলাপোকাটা ধরতেই সেটা নড়ে উঠল। আরে এটাতো মরে নাই। তেলাপোকাটা আবার মেঝেতে ছেড়ে দিতেই নিমিষেই উধাও। আরে ব্যাটা নচ্ছার। কোথায় গিয়ে মরলি।

ফাউল মিয়া ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। মাথা দপদপানিটা এখন অনেকটাই কম। তার শান্তি শান্তি লাগছে। তবে তার মাথার ভেতর ঢুকে গেছে তেলাপোকার বিষয়টা। তেলাপোকার বিষয়টা তার মাথায় ঘুর ঘুর করেছ। এতো দেখি ভারি যন্ত্রণা হলো। যেটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই সেটাই মাথায় ঘুরঘুর করছে। করুক। মাথার ভেতর ঘুরে ঘুরে তুই মর। তখন পালিয়ে বেঁচেছিলি, এখন মরার জন্য রেডি হও। ফাউল মিয়া মাথার ভেতর অদৃশ্য তেলাপোকার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলল।

কিছুক্ষণ বাদেই ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে উঠল ফাউল মিয়া। সে পেয়েছে, সে পেয়েছে আইডিয়া। তাকে এখন আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কিসের আইডিয়া?

আইডিয়াটা কাগজে লিখে রাখছে ফাউল মিয়া। পরিকল্পনায় সে কোনো ফাঁক রাখতে চায় না। কাজটা এমনভাবে করতে হবে যেন কেউ কোনোভাবেই বুঝতে না পারে ফাউল মিয়া কাজটা করতে যাচ্ছে বা কাজটা করার পরেও যেন কেউ বুঝতে না পারে কাজটা ফাউল মিয়াই করেছে। ঘন্টাখানেকের পরিশ্রমেই সে পরিকল্পনাটা দাঁড় করিয়ে ফেলল। একেবারে নিখুঁত পরিকল্পনা। ফাউল মিয়া রোবট আসিমোকে চুরি করবে। চুরি করবে তাকে অজ্ঞান (!) করে। তারপর চুরি করবে আসিমোর মাথার ভেতর রাখা পাসওয়ার্ড বোমার কোড।

সকাল থেকেই কাজে বসেছে ফাউল মিয়া। আজ তার অনেক কাজ। আজ যে কোনো সময় সে রোবট আসিমোকে চুরি করবে। অফিসে এসে সে বার কয়েক উঁকি দিয়েছে আসিমোর ঘরে। আসিমো নোটবুকে কাজ করছে। সে জানে তার বস আজ দুপুরের পরে চার্জ নেবে।

আসিমোর গভীর কাজে ডুবে আছে। তার চার্জ আছে মাত্র অল্প পরিমাণে। ওটুকু ফুরিয়ে যাবার আগেই তার চার্জ লাগবে। চার্জ না দিলে সে অচল হয়ে যাবে। আসিমোর কাজ দেখে মনে হচ্ছে চার্জের বিষয়টা তার মাথায় নেই। আর এ সুযোগটাই নিতে চাচ্ছে ফাউল মিয়া। এ সুযোগেই সে কাজটা সারবে।

সে আগ বাড়িয়ে বিল গেটসের কাছে গিয়ে জেনে এসেছে আজ আসিমোকে তার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা। বিল গেটস জানিয়েছেন,

না আজ আসিমোকে তার কোনো কাজে লাগবে না। তার সাথে কোনো অ্যাপয়েনমেন্টও নেই তার। তবে আগামীকাল সন্ধ্যায় আসিমোর সাথে তার একটা মিটিং আছে।

আসিমো ফাউল মিয়াকে খোঁজ নিতে বলেনি। সে-ই আগ বাড়িয়ে খবর আনতে গেছে। বিল গেটস কোনো সন্দেহ মনে আনেনি। কারণ ফাউল মিয়া আসিমোর পিয়ন। পিয়ন এসব খবরা খবর রাখবে। বিল গেটস ভেবেছেন আসিমো ফাউল মিয়াকে এ খবরটা নিতে পাঠিয়েছেন। ফাউল মিয়ার এ কূটচালটা তিনি বুঝতে পারলেন না।

ফাউল মিয়া বিল গেটসের রুম থেকে বেরিয়ে সময়ের হিসাব মেলালো। আগামীকাল সন্ধ্যায় মিটিং। হাতে তার অফুরন্ত সময়। এরই মধ্যে তাকে আসিমোকে চুরি করে সটকে পড়তে হবে। সে তার শরীর ছেড়ে দিল চেয়ারে। আরামে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। এমন শান্তি তার আগে কোনো দিন লাগেনি। সে এখন অনেকটাই নির্ভর। এখন তার সময় গোনার পালা।

ফাউল মিয়ার চোখ ধরে এসেছে। ওদিকে ফোন বাজার শব্দ হচ্ছে। চোখ বোজা অবস্থায় সে টেবিল হাতড়াচ্ছে। খুঁজে পাচ্ছে না ফোন সেটটা। অবশেষে তার ট্রাউজারের পকেটে পেলো সেটা। ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে ওর বস স্যামুয়েল মল্লিকের গলা শুনতে পেল।

সব ঠিকঠাক মতো আছেতো?

হ্যাঁ, স্যার। এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মতো আছে। পরিকল্পনা মতো এগুচ্ছে সবকিছু। সমস্যা হলে আমি জানাব।

ঠিক আছে আমি ছাড়ছি। দেখো কোনো সমস্যা যেন না হয়। আর সমস্যা হলেও যেন আমার নাম এবং আমার প্রতিষ্ঠানের নাম ঘুনাক্ষরেও যেন প্রকাশ না পায়।

আমাকে মনে হয় এতো বুঝিয়ে বলা লাগবে না। একটু আধটু না বুঝলেতো আর মার্কিন মুলকে এসে চাকরি করতে পারতাম না। তার কণ্ঠে খানিকটা উপহাসের সুর। ওপাশে থেকে স্যামুয়েল মল্লিক ফোনের লাইন কেটে দিলেন। মোবাইল ফোনটা টেবিলে রাখতে না রাখতেই ফাউল মিয়ার আবার ফোন এলো। আবার কে বলে সে ফোনের সিরিভার তুলল। আসিমো ফোন করেছে। তাকে এখুনি যেতে হবে।

ফাউল মিয়া গিয়ে দেখে তার বস আসিমো সোফায় শুয়ে আছে।

এসো ফ্যাটাউল মিয়া। ভেতরে এসো।

ফাউল মিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল দ্রুত। আসিমো সব সময় তাকে ফ্যাটাউল মিয়া বলে ডাকবে। সে চায় না তাকে আসিমো ফ্যাটাউল মিয়া বলে ডাকুক। তার মনে হয়, এর চেয়ে আহিরের ডাকা ফাউল মিয়া নামটাই ভালো। শুনতে খারাপ লাগলেও কেমন যেন অন্যরকমের একটা গন্ধ আছে নামটার মধ্যে। ওই গন্ধটাই যেন আসল। যদিও আসিমো ফাউল মিয়াকে তেমন একটা নাম ধরে ডাকে না। ডাকার প্রয়োজনও পড়ে না।

শোনো, দাঁড়িয়ে থেকো না। আসিমো বলল। আমার চার্জ প্রায় শেষ। হাতে সময় আছে মাত্র ১ মিনিটের মতো। তুমি ড্রয়ার থেকে কর্ডটা বের করে আমাকে চার্জ দাও। জলদি করো, কুইক।

ফাউল মিয়া তাড়াতাড়ি ড্রয়ার খুলে চার্জ দেবার কর্ডটা বের করল। কিন্তু তাতে সংযোগ দিতে সময় নিল।

কি ব্যাপার, এতো সময় লাগছে কেন? তাড়াতাড়ি কর।

জ্বি স্যার, করছি। এখনই ঠিক করে দিচ্ছি।

জলদি করো। চার্জ থাকতে না দিলে আমি আবার পুরোপুরি অক্ষম হয়ে যাব।

ফাউল মিয়ার ঘুম ভাঙেনি। বেঘোরে ঘুমুচ্ছে সে। তার ঘুম ভাঙল বিমানবালার ডাকে। তার সামনে বিমানবালা রাতের খাবার হাতে দাঁড়িয়ে। ঘুম ভেঙে সে চোখ কচলাতে কচলাতে সে বাইরে তাকিয়ে দেখে রাতের অপূর্ব শোভা। রাতের শরীর জ্যোৎস্নার প্লাবনে সিক্ত। আকাশে এক ফালি চাঁদও আছে। বিমানটা সেই জ্যোৎস্নাপুরির মাঝ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

ফাউল মিয়া রাতের খাবার খেয়ে আবারো ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল চোখে সূর্যের আলো পড়ায়। বিমানের জানালা দিয়ে সূর্যের আলো আসছে। চোখ কচলাতে কচলাতে জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে কালো রঙের ছায়া। বিমানে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে, আমরা এখন কুয়ালালামপুরে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিমান ভূমিতে অবতরণ করবে।

বিমান নিচে নামছে কালো রঙের ছায়াগুলো চোখের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে, ওগুলো পাম গাছ। বিমান থেকে যখন বাইরে বেরুলো ফাউল মিয়া তখন সেদেশের ঘড়িতে সকাল আটটা। ঘড়ির সময় বদলে ডিপার্চার লাউঞ্জের দিকে হাঁটতে থাকে সে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে লাগেজ বুঝে নিয়ে একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করে ফাউল মিয়া কুয়ালালামপুরের উদ্দেশে যাত্রা করল। দেড় ঘন্টার মধ্যেই সে পৌঁছে গেল জালান সুলতান ইসমাইলের পাঁচতারা হোটেল ক্রাউন প্লাজায়। আবারো সেই ক্রাউন প্লাজা। এই নামের হোটেল তার পিছু ছাড়ছে না। আমেরিকাতেও সে কিছুদিন ক্রাউন প্লাজা হোটেলে ছিল। এটা একটা চেইন হোটেল। সারাবিশ্বে তাদের শাখা আছে। সাথে সাথে ফাউল মিয়ার মনে পড়ল, না, এ নামে বাংলাদেশে কোনো হোটেল নেই। সে তার জন্য আগে থেকে নির্ধারিত রুমের চাবি রিসেপশন থেকে নিয়ে ২১ তলায় তার জন্য বরাদ্দ ১৪ নম্বর কক্ষে গিয়ে ঢুকল। ফ্লোর বয় তার বাক্স-প্যাটরা দিয়ে গেল। ফাউল মিয়া কোনো মতে রুমের দরজা বন্ধ করে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। দীর্ঘ বিমান ভ্রমণে সে ক্লান্ত।

আহির বিমান থেকে কুয়ালালাপুরে নামে সকাল ১০টায়। সে একটা ট্যাক্সিক্যাব নিয়ে জালান সুলতান ইসমাইলে পাঁচতারা হোটেল নভোটেলে উঠল। মালয়েশীয়রা সড়ক বা রাস্তাকে বলে জালান। নভোটেল আর ক্রাউন প্লাজা হোটেল দু'টোই পাশাপাশি।

তার জন্যও এই হোটেলে কামরা আগে থেকেই বুক করা ছিল। সে গিয়ে উঠল ১৪ তলায় ৩ নম্বর কামরায়। তার বেশ খিদে পেয়েছে। কামরায় ব্যাগপত্তর রেখে সে হোটেলের বাইরে বেরুল দেখি কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা এই আশায়। আহির ক্রাউন প্লাজা হোটেলের সামনের জালান সুলতান ইসমাইল ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটুখানি সামনে গিয়ে পেল একটি চাইনিজ খাবারের দোকান। রাস্তার ধারের খোলা দোকান। খাবারের অর্ডার দিল ফ্রাইড রাইস, ডিমের অমলেট আর চিংড়ি ভুনা। সাথে নিল একটা বড় সাইজের পেপসি। না চাইতে অবশ্য বেয়ারা অবশ্য তাকে একটা হেনিকেনের বোতল দিয়ে গেল। আহির সেটা ফিরিয়ে নিতে বলল বেয়ারাকে। বেয়ারা ওটা টেবিল থেকে তুলে নেবার সময় বার কয়েক আহিরের দিকে তাকাল বটে। তার তাকানোতে ছিল করুণ চাহনি। অবস্থাটা এমন যে একটা বোতল আহির রাখলেই বয়টা বতলে যায়। আহির কোনো দিকে না তাকিয়ে গো-গ্রাসে সব খাবার গিলতে লাগল। আহা! এমন সুখাদ্য সে কতকাল খায়নি।

ফাউল মিয়া আজ আর হোটেল থেকে বের হলো না। খাবার রুমে আনিয়ে খেল। তবে আজ সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করল। আসিমোকে কফিন থেকে বের করল। চার্জ দিল ঘন্টাখানেকের জন্য। তার আগে সে আরেকটা কাজ করল। আসিমোর মাথার ভেতর থেকে মাইক্রোসিডিটা বের করল। চার্জ দেয়া শেষ হলে আসিমোকে চালু করল ফাউল মিয়া।

চালু করলেও আসিমোকে সচল হতে দিল না সে। আসিমোর সার্কিট বের করে সে আসিমোর প্রোগ্রামিংটা বদলে দিল। আসিমোর স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে নিমিষে উধাও হয়ে গেল বিল গেটস, মাইক্রোসফটসহ সবকিছু। আসিমোর আগের কিছুই আর মনে নেই। এখন থেকে ফাউল মিয়া যা বলবে সে তাই শুনবে। ফাউল মিয়াই এখন তার মনিব।

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা সেরে ফাউল মিয়া আসিমোকে পাসওয়ার্ড দিয়ে অচল করে রাখল।

কাজটা করে ফাউল মিয়া তার বস স্যামুয়েল মল্লিককে ফোন দিল। সব ঘটনা খুলে বললেও বলল না আসিমোকে সচল করার কথা। বস তাকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা জানাল। ফাউল মিয়া জানল, কয়েকদিনের মধ্যে তার বস আসছে।

ফাউল মিয়া এবার নিজেই ষড়যন্ত্র করতে শুরু করল তার বসের সাথে। না, সে কিছুতেই আসিমোর মাথার ভেতর বসানো মাইক্রোসিডিটা তার বসকে দেবে না। সে নিজেই বিল গেটসের কাছ থেকে টাকা আদায় করবে। সে নিজেই ধনী হবে।

আজকে রাতটা সে ক্রাউন প্লাজাতে থাকবে। কাল রাতে সে হোটেল বদলাবে। নতুন কেনা সিমটাও সে ফেলে দেবে। সে হয়ে যাবে অন্য মানুষ। সে চলে যাবে তার বসের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ফাউল মিয়া পর্যন্ত হোটেলেই থাকল। বের হলো না। তবে ঠিক করে রাখল একটা গাড়ি ভাড়া করে সকালে গেনটিং হাইল্যান্ডে বেড়াতে যাবে। সাথে নেবে আসিমোকে।

আহিরের কোনো কাজ নেই। এই এতোবড় দেশে সে কোথায় খুঁজবে ফাউল মিয়াকে। তার মনে হলো, এ দেশে বেড়ানোর জায়গাগুলোতে খুঁজলে কেমন হয়। এ দেশে এলে কেউ না বেড়িয়ে ফেরে না। সে রাতের বেলা রিসিপশনে গেল কাছে পিঠে কোথাও বেড়ানোর জায়গা আছে কিনা যেখানে দিনে গিয়ে দিনে ফিরে আসা যায়। রিসিপশন থেকে জানানো হলো, গেনটিং হাইল্যান্ডের কথা। সকালে হোটেল থেকে একটা টুরিস্ট গাড়ি যাবে। আহির ইচ্ছে করলে ওদের সাথে প্যাকেজে যেতে পারে। আহির রাজি হয়ে প্যাকেজের একটা টিকিট কিনল।

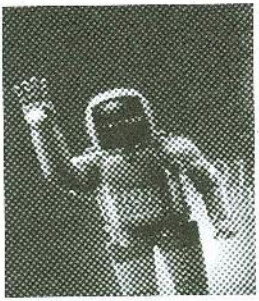

পরদিন সকালে হোটেলের প্যাকেজে ওরা রওনা হলো গেনটিং হাইল্যান্ড। ফাউল মিয়া গেল একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে। ওরা দু'জন গাড়ির পেছনের সিটে বসেছে। ফাউল মিয়া আর আসিমো। আসিমো ফাউল মিয়ার ডান পাশে বসেছে। সে ফাউল মিয়াকে স্যার ডাকছে। ফাউল মিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করছে।

আসিমোর এই পরিবর্তন দেখে ফাউল মিয়া অবাক। তার এই পরিবর্তন দেখে অবাক হবার কিছু নেই। আসিমোর চালিকা শক্তি যে প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রাম ফাউল মিয়া পরিবর্তন করে দিয়েছে। তার ফলেই আসিমোর এই পরিবর্তিত আচরণ। ফাউল মিয়া আসিমোর বিষয়টি বুঝলেও অন্যরা বুঝতে পারছে না, বুঝতে পারছে না গাড়িরচালকও। গাড়ির চালকের কাছে আসিমো তার মতোই একজন মানুষ।

কুয়ালালামপুর সিটির ৫১ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে গেনটিং হাইল্যান্ড। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২ হাজার মিটার ওপরে গড়ে উঠেছে এই পর্যটন শহর। প্রায় পৌনে ১ ঘণ্টা চলার পর দূর থেকে পাহাড়ের চূড়ায় উড়ে চলা মেঘের মাঝে ছোট্ট একটা শহর দেখা গেল। এটিই গেনটিং হাইল্যান্ড। আরো প্রায় ১০ মিনিট পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তা পেরিয়ে আহিরদের বাস থামল।

স্কাইওয়ের একটি ফাস্ট ফুডের দোকানে বসে সে নাশতা করল। মেনু 'নাইস আইয়াম'। এই খাবারটি মালয়েশিয়ানদের খুবই প্রিয়। অনেকটা আমাদের 'চিকেন রাইস'-এর মতো, ফ্রাইড রাইসও বলা যায়। ডিম ফ্রাই দিয়ে আহির পেট পুরে খেল। আহির একটা বিষয় খেয়াল করেছে, মালয়েশিয়ায় এসে সে যা খাচ্ছে তাই ভালো লাগছে। নাইস আইয়াম খেতেও বেশ লাগল তার।

এই গেনটিং হাইল্যান্ডটি মালয়েশিয়া সরকারের তত্ত্বাবধানে চীনা বিনিয়োগে নির্মিত হয়েছে। আহির ক্যাবল কারে চড়ার জন্য লাইনে দাঁড়াল। ১৮ মিনিটের এই যাত্রাপথে পাহাড়ের ওপর দিয়ে, বড় বড় গাছপালার ওপর দিয়ে তারা পৌঁছলো মূল হাইল্যান্ডে।

গেনটিং হাইল্যান্ডটি মানুষ আর মেঘের ভাগাভাগির শহর। উঁচু উঁচু ভবনের মাঝ দিয়েই উড়ে যাচ্ছে মেঘ। এই রোদ্দুর, খানিক পরেই তা নেই, কেমন কুয়াশা কুয়াশা ভাব। কিছুক্ষণ গরম লাগলেও খানিক পরে কেমন হিম হিম ভাব। তাপমাত্রা ১৬ থেকে ২৩ ডিগ্রির মধ্যে। এ রকম একটি পরিবেশের মধ্যেই বেশ ক'টি পাঁচতারা হোটেল, অ্যাপার্টমেন্ট, অফিস, বাড়ি নিয়ে এই ছোট্ট পর্যটন শহর। এ ছাড়াও এখানে শিশু-কিশোরদের জন্য মজার স্বপ্নপুরী, থিমপার্ক তো আছেই, আরো আছে ট্রেন বাস। এই বাস ট্রেনের বগির মতো। চলে খুব ধীরে ধীরে। পুরো শহরটিরে ঘুরে দেখার জন্য এটি খুবই জুৎসই। হোটেল ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের সামনে চীনাদের ঐতিহ্যবাহী নাচ দেখে আহির ভীষণ মুগ্ধ। মালয়েশিয়ার একমাত্র ক্যাসিনোটি এখানে। আহির ক্যাসিনোতে ঢুকে গেল।

ফাউল মিয়া আর আসিমো দাঁড়িয়ে আছে ক্যাসিনোর সামনে। তারা ভিতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছে। কি মনে করে তারা ভেতরে ঢুকল না। সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ক্যাসিনোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আহির। একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে হাতের কাছে আসিমোকে না পেয়ে ফাউল মিয়া পেছন ফিরল। পেছনে ফিরে আসিমোকে না দেখে দেখল আহিরকে।

ভীষণ চমকালো সে। সে একি দেখছে। এখানেও আহির। ফাউল মিয়া চট করে মুখ ফিরিয়ে আসিমোকে খুঁজতে লাগল। আসিমো তার ডান পাশে দাঁড়িয়ে। সে আসিমোর হাত ধরে দ্রুত স্থান ত্যাগ করল। এখনই তাদের ফিরতে হবে। আর এখানে নয়।

ফাউল মিয়া বেশ বুঝতে পারছে আহির তার পেছনে লেগেছে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। তার এতো কাছের বন্ধু আহির তার পেছনে লাগবে? সে ভেবে পায় না।

আহির ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে গেল বাতু কেভসে। কুয়ালালামপুর সিটি থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তরে মালয়েশীয় হিন্দুদের পবিত্র স্থান বাতু কেভস। ১০০ মিটার ওপরে বিশাল পাহাড়ের মধ্যে পাশাপাশি তিনটি বড় এবং তুলনামূলক ছোট একটি গুহার সমন্বয়ে বাতু কেভস। মোট ৪০০ মিটার দীর্ঘ এ গুহাগুলো ১৮৯২ সালে আবিষ্কৃত হয়। বাতু কেভসের সামনে গুহায় প্রবেশ করার জন্য সিঁড়ি আছে। সহজভাবে বোঝার জন্য বলা যেতে প্রায় ২২ তলা উঁচু ভবন পরিমাণ উঁচু এই সিঁড়ি। ওপরে কয়েকটা দোকান আছে। সেখানে ডাব দেখে আহিরের খেতে ইচ্ছে হলো। প্রচণ্ড পানি পিপাসা পেয়েছে। সে একটা ডাব কিনে পিপাসা মেটালো।

বাতু কেভস আসলে পাহাড়ের বিশাল প্রাকৃতিক গুহা। বিশাল বিশাল হলরুমের কয়েকটি জোড়া দিলে এর একটির সমান হবে। গুহার মাঝে মাঝে ফাঁকা থাকাতে সহজেই আলো প্রবেশ করতে পারে এখানে। ভেতরে বাইরে হিন্দু দেব-দেবীর প্রচুর

মূর্তি আছে, মন্দিরও আছে কয়েকটি। বানর আছে বেশ ক'প্রজাতির। এদেরকে সবাই বেশ আদর করে, খাবার দেয়, ভক্তি করে। বাতু কেভস দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে গেল। এবার তাদের গাড়ি শহরে ফিরবে। বিকেল নাগাদ আহির হোটেলে ফিরে এলো। হোটেলে ফিরে ফোন পেল নাসির আলীর।

নাসির আলী পরশু আসছে।

সংবাদটা শুনে আহির নিশ্চিন্ত হলো। যাক তাহলে দু'জনে মিলে খুঁজে বের করবে ফাউল মিয়া আর আসিমোকে। আহির আর বের হলো না বাকি সময়টা হোটেলেই কাটিয়ে দিল।

বিকেলের আগেই হোটেলে ফিরেছে ফাউল মিয়ারা। তারা আর এ হোটেলে থাকতে চায় না। অন্য কোথাও যেতে চায়। ফাউল মিয়া হোটেলে ফিরে কুয়ালালামপুরে যত হোটেল আছে, সবগুলো হোটেলে খোঁজ নিয়েছে। শেষমেশ ও জানতে পেরেছে পাশের নভোটেল হোটেলে উঠেছে আহির নামের একজন বাংলাদেশী। খবরটা পেয়েই সে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

এতো কাছাকাছি আছি আমরা, কি সর্বনাশের কথা। ভাগ্যিস আহির জানে না। জানলে নিশ্চয় ও এতোক্ষণে আমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়ত। না আর এখানে থাকা যাবে না। সন্ধ্যার পরে এখান থেকে পালাতে হবে। সন্ধ্যার পরই উত্তম সময়। ফাউল মিয়া নতুন পরিকল্পনা করছে।

হোটেলে ফেরার পরে আসিমোর আবার জায়গা হলো কফিনে। আসিমো সচল থাকা অবস্থায় ফাউল মিয়া তাকে অন্য হোটেলে নিতে চায় না। আসিমোকে দেখলে হোটেল কর্তৃপক্ষ ভাববে ওরা দু'জন, ডাবল বেড নিতে হবে। শুধু শুধু খরচ বাড়িয়ে লাভ কি।

ঘন্টাখানেক ঘুম দিয়ে উঠে আহির হোটেলের লবিতে বসে চায়ের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। চা এসে গেছে। চায়ে চিনি মিশিয়ে সে কেবল চুমুক দেবে এমন সময় তার নজরে এলো ফাউল মিয়া। সে বোচকা-বাচকি নিয়ে হোটেলের সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। বারবার নভোটেল হোটেলের দিকে তাকাচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছে ফাউল মিয়া। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল আহির। উত্তর মিলল না। এই রে, এসব ভাবতে গিয়ে আবার শিকার হাত ছাড়া হয়ে না যায়।

আহির দৌড়ে হোটেলের বাইরে এলো। ওইতো ফাউল মিয়া হাঁটতে হাঁটতে এগুচ্ছে। আহির নিরাপদ দূরত্ব রেখে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

একটু এগুতেই ফাউল মিয়ার সামনে পড়ল আরেক পাঁচতারা হোটেল মায়া। সে হোটেল মায়াতে ঢুকল। আহির বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছে। রিসিপশনের পাট চুকিয়ে ফাউল মিয়া তার সবকিছু নিয়ে ভেতরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আহির হোটেলের কাউন্টার থেকে ফাউল মিয়ার সব তথ্য নিল। ফাউল মিয়া মায়া হোটেলের ১৪ তলায় ১০ নম্বর কক্ষ ভাড়া নিয়েছে। আহির যেন হাঁফ ছেড়ে বাচল। যাক শিকার হাতের নাগালেই আছে।

ফাউল মিয়াও তার কামরায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাচল। যাক আপাতত মুক্তি মিলল। সে ফোন দিল স্যামুয়েল মল্লিককে। স্যামুয়েল মল্লিক জানালেন, আজ রাতের ফ্লাইটে তিনি কুয়ালালামপুর আসছেন। ওম শান্তি! বলে ফোন রেখে দিল ফাউল মিয়া।

স্যামুয়েল মল্লিক জানালেন, তিনি বিমান থেকে নেমে সরাসরি হোটেলে চলে আসবেন। তাকে আনতে যাবার দরকার হবে না। ফাউল মিয়া যেন হোটেলেই থাকে, বাইরে না যায়।

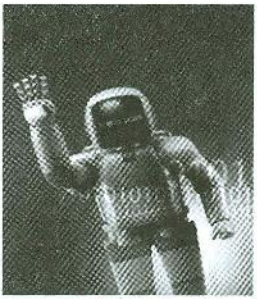

স্যামুয়েল মল্লিক সকাল ৯টা নাগাদ হোটেল মায়ায় এসে পৌছলেন। নিজের কামরায় না গিয়ে তিনি গেলেন ফাউল মিয়ার কামরায়। ওখানে গিয়ে প্রথমেই দেখতে চাইলেন আসিমোকে। কফিন বন্দী আসিমোকে দেখে তিনি যারপরনাই খুশি হলেন। তার চেয়ে বেশি খুশি হলেন, মাইক্রোসিডিটা দেখে। তিনি বললেন, এটা কোনোভাবেই হাত ছাড়া করা যাবে না। তিনি সিডিটা হাতে নিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

এটা আমার স্বপ্ন। স্যামুয়েল মল্লিক বলছেন, আমি হব এই পৃথিবীর সব চেয়ে ধনী। বিল গেটস তার সকল ধন-সম্পদ আমাকে দিলেই কেবল এই সিডিটা তাকে দেয়া হবে, না হলে নয়। সারা বিশ্বের এতো বড় ক্ষতি নিশ্চয় তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারবেন না। অতএব সুযোগ এটাই। টাকা কড়ি পেলেই কেবল সুযোগ মতো এটা ধ্বংস করা হবে।

তিনি ফাউল মিয়াকে ধন্যবাদ দিতে ভুললেন না। ফাউল মিয়া যে মনে মনে অন্য ফন্দি আঁটছে, তা জানতে পারলেন না স্যামুয়েল মল্লিক।

আহির আজকে সকাল থেকে এ পর্যন্ত দু'বার ফাউল মিয়ার খোঁজ করেছে। সে হোটেল থেকে বের হয়নি। হোটেলেই বসে আছে। হোটেলের কনসিয়ার্জে দায়িত্বরত একজনকে মোটা অংকের টাকা ঘুষ দিয়ে সে এসব তথ্য পেয়েছে। সে অপেক্ষা করছে নাসির আলীর জন্য।

ফাউল মিয়া বিকেলে একবার হোটেল ছেড়ে পালাতে চেয়েছিল কিন্তু ওর বসের কারণে তা পারেনি। ওর বস সারাক্ষণ ওর রুমেই ছিল। এক সময় নিজেই নিজের পরিকল্পনাটা বাতিল করে দিল ফাউল মিয়া। সে একা এ জিনিস এ রক্ষা করতে পারবে না।

তার চেয়ে সে তার বসকে ওটা দেয়া শ্রেয় বলে মনে করল। ওটা দিলে স্যামুয়েল মল্লিক ওনার প্রতিশ্রুতি মতো যে টাকা দেবে সে টাকায় তার জন্য অনেক। ফাউল মিয়া রণেভঙ্গ দিল।

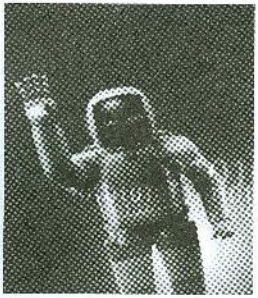

পরদিন সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ হোটেলে পৌঁছলেন নাসির আলী। তিনিও নিজের কামরায় না গিয়ে সরাসরি গেলেন আহিরের কামরায়। পৌঁছেই তিনি সবকিছু শুনলেন আহিরের কাছ থেকে। বললেন...

সবইতো শুনলাম, বিকেলে বসে না হয় পরিকল্পনা চূড়ান্ত করব। তারচেয়ে এখন বিশ্রাম করে কাটাই। আপনি কি বলেন?

ঠিক আছে। আহির বলল। চলুন আপনাকে আপনার কামরা দেখিয়ে দিয়ে আসি।

ওরা দু'জন নাসির আলীর কামরায় গেল। বিশ্রামের পর বিকেলে আহির ও নাসির আলী মিলে ঠিক করল, আগামীকাল দুপুরে ওরা ফাউল মিয়াদের পাকড়াও করবে। তার আগে ওদের কয়েকটা কাজ করতে হবে।

এক. মালয়েশিয়ান পুলিশকে খবর দেয়া। তাদেরকে পুরো বিষয়টা খুলে বলতে হবে। তারা নিশ্চয় সাহায্য করবে।

দুই. বিল গেটসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। যদিও সে যোগাযোগ করতে চাইবে না।

তিন. ওদের কাছ থেকে সবার আগে মাইক্রোসিডিটা উদ্ধার করতে হবে।

চার. আসিমোকে সচল করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হবে। এর আগে আসিমোকে ফাউল মিয়ার কবল থেকে উদ্ধার করে আবারো অচল করে ফেলতে হবে।

পাঁচ. ভ্যানিলা স্কাইয়ের কোড উদ্ধার করে সেটা কি করা হবে তা ঠিক করা হবে। কারণ হাতে মোটে এক বছরেরও কম সময় থাকবে।

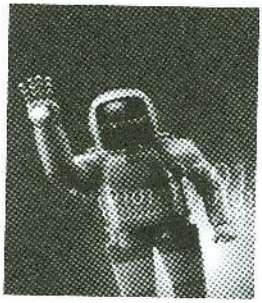

পরদিন সকাল হতেই অস্থির হয়ে পড়ল আহির। তাকে বার বার শান্ত থাকার পরামর্শ দিলেন নাসির আলী। বললেন..

আহির সাহেব এখনই উত্তেজিত হবেন না। শান্ত হোন। কাজের কাজ এখনো কিছুই হয়নি। কাজের সময়ের জন্য শক্তি জমা করে রাখুন।

আহিরের কানে কোনো কথা ঢুকছে না। সে আছে তার মতন। নাসির আলী এরই মধ্যে কয়েকবার গিয়ে মায়া হোটেলে গিয়ে রেকি করে এসেছেন। তার ধারণা, কেউ তাকে চিনতে পারবে না। তিনি সাথে আহিরকে নেননি। শেষ বার বেলা ১১টায় উনি খবর নিয়েছেন, ওরা হোটেলেই আছে। কোথাও বের হবে না। তবে ওরা হোটেলে জানিয়ে রেখেছে বেলা ২টায় ওরা চেক আউট করবে। যদিও হোটেলের চেক আউট টাইম দুপুর ১২টায়।

এ কারণেই আহিরের অস্থিরতা। ফসকে না গেলেই হয়। আচ্ছা, ওরা কোথায় যাচ্ছে। অন্য কোনো দেশে না বাংলাদেশে? সে নিজেই তার মাথা দোলালো। উত্তর সে জানে না। জানবে কি করে।

আহির বেলা ১২টায় মায়া হোটেলের পাশে অবস্থান নিতে চাইছে। নাসির আলীর তাতে আপত্তি। বেলা এক থেকে দেড়টার মধ্যে ওখানে থাকলেই চলবে। আহিরকে বললেন নাসির আলী।

আহির তাতে ভরসা পায় না। হোটেলের রিসিপশন থেকে যদি ওদের ভুয়া তথ্য দেয়া হয়ে থাকে। ওরা যদি নিজেদের বাঁচাতে আহিরদের চোখে ধুলে দেবার চেষ্টা করে। তাহলে? না বাবা, এতোবড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। সে সাড়ে বারোটা নাগাদ মায়া হোটেলের সামনে যাবে বলে ঠিক করেছে। নতুন পরিকল্পনার কথা শুনে নাসির আলী কেমন যেন জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন আহিরের দিকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ওই সময় যেতে রাজি হলেন।

ঘড়িতে এখন দুপুর ১২টা বাজে।

ফাউল মিয়ার মনটা খচখচ করছে। তার মন বলছে আহির তাদের আশপাশে কোথাও আছে। যেহেতু তাকে মালয়েশিয়ায় দেখা গেছে, সেহেতু সে এখানে না এসে পারেই না। হয়তো আড়ালে কোথাও থেকে সে তাদের চোখে চোখে রাখছে। এই আশংকার কথা সে স্যামুয়েল মল্লিককে জানিয়েছেও। মোক্ষম কোনো জবাব সে পায়নি, বিবিধ কারণেই তার মনটা খচখচ করছে। তারা হোটেল থেকে ২টায় বের হবে বলে ঠিক করেছে। তাদের বিমান ৫টায়। তাই হোটেল থেকে ২টার সময় বের হওয়াটাকে স্যামুয়েল মল্লিক যুক্তিযুক্ত বলে ধরে নিয়েছে।

ফাউল মিয়ার অবশ্য তাতে অস্বস্তি হচ্ছে। একটু আগেভাগে বের হলে কি হয়। যেহেতু মনে কু-ডাক ডাকছে। তার এ ভাবনাকে আমলেই নিচ্ছে না স্যামুয়েল মল্লিক। তিনি ফাউল মিয়াকে বললেন,

দুশ্চিন্তা না করে করে তার চেয়ে বরং আসিমোকে প্যাকিং করে ফেল। সিডিটা ওর মাথার ভেতরে রাখার দরকার নেই। যদি বিমানে লাগেজ মিসিং হয় তাহলে কিন্তু ওটা আর উদ্ধার করা যাবে না। তিনি ফাউল মিয়ার কাছ থেকে নিয়ে কোটের পকেটে রাখলেন। বললেন,

থাক, এটা আমার কাছে থাক। দেশে নিয়ে যাবার পরে এটা আমার কাছেই থাকবে।

ফাউল মিয়ার একটু মন খারাপ হলো বটে। তার স্বপ্নও পূরণ হবে না তাহলে? সে কেবল ঘোষিত পুরস্কারের টাকাই সে পাবে?

ফাউল মিয়ার মনে কোনো স্বস্তি নেই। সে লাগেজ গোছাতে লাগল। লাগেজ গোছানো শেষ হয়নি, এরই মধ্যে শোনা গেল স্যামুয়েল মল্লিকের নাক ডাকার শব্দ।

আহির কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল। সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। এখনই যাবার সময়। সে নাসির আলীকে হাত ইশারা করতেই দু'জনে মিলে বেরিয়ে পড়ল

হোটেল থেকে। দু'জনই রোদের মধ্যে জালান সুলতান ইসমাইল ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলল, মায়া হোটেলের দিকে।

তারা মায়া হোটেল থেকে একটু দূরে একটা পাম গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। গাছটা ঝোপ মতো, একটু আড়াল হলেও ওরা সামনের অংশটা পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে। ওদের কাছ থেকে ১০০ ফুট দূরত্বে হবে মায়া হোটেলের প্রবেশ দ্বার।

নাসির আলী পুলিশকে ফোন দিয়ে তাদের অবস্থান জানালেন। পুলিশ তাকে জানালো, তারা ১০ মিনিটের মধ্যে হোটেলের আশেপাশে অবস্থান নেবেন। ওরা নাসির আলীকে জানাল, তারা এরই মধ্যে ইউএস কেন্দ্রীয় পুলিশ, এফবিআই-এর সাথে যোগাযোগ করেছে। ওখান থেকে মালয়েশিয়ান পুলিশকে সবুজ সংকেত দিয়ে বলা হয়েছে ওদের দু'জনকে গ্রেফতার করতে। ওই দু'জনকে গ্রেফতার করতে পারলেই ওরা মালয়েশিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবে। ওরা বিল গেটসকেও মালয়েশিয়া আসার জন্য বলেছেন। এখনো পর্যন্ত তিনি সম্মতি দেননি মালয়েশিয়ার আসবার ব্যাপারে।

নাসির আলী দেখলেন, ১০ মিনিটের মধ্যে মালয়েশিয়ান পুলিশ মায়া হোটেলের আশেপাশে অবস্থান নিয়ে ফেলেছ। পুলিশ আসায় তিনি বেশ স্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি আহিরকে ভি-সূচক চিহ্ন দেখালেন।

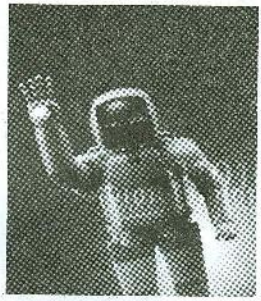

ফাউল মিয়াদের হোটেলের বিল আগেই মেটানো ছিল। তারা সরাসরি নিচে নেমে এসে লবিতে বসল। কিন্তু কেন বসল তা ফাউল মিয়ার কাছে পরিষ্কার নয়। তাকে বসিয়ে রেখে স্যামুয়েল মল্লিক লবির শেষ মাথায় গেলেন। ওখানে ৫ তামিল যুবক বসা। স্যামুয়েল মল্লিক ওদের সাথে কিসব কথা বললেন, ফাউল মিয়া এ প্রান্তে বসে কিছুই শুনল না। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। বুকটা তার ধুক ধুক করছে, তবে সেটাকে ফাউল মিয়া বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না। তার ভয় কেবল আহিরকে। ওর সাথে আবার দেখা হয়ে যাবে নাতো?

ফাউল মিয়ার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওই ৫ যুবক। ওদের গায়ের রং মিশমিশে কালো। গালে খোচাখোচা দাড়ি। বেঁটে মতো একজনের গালে দেড় ইঞ্চি কাটা দাগ। আরেকজনের থুতনির নিচে আধ ইঞ্চির মতো কাটা। সবার মাথার চুল কদম ছাঁট দেয়া। সবার চেহারা ভয়ংকর টাইপের। ওদের সবার হাতে গলায় মালা, বালা, ব্রেসলেট। পরনে অনেক দিনের ছেঁড়া ময়লা জিন্স প্যান্ট। ওরা কতদিন গোসল করে না কি জানি। ওদের গা দিয়ে ভুর ভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে। ফাউল মিয়ার পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

স্যামুয়েল মল্লিক ওদের সাথে ফাউল মিয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল...

ওরা আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টা দেখবে। ওরা আমাদের নিরাপদে বিমান বন্দরে পৌঁছে দেবে।

ফাউল মিয়া বুঝে গেল ওদের পরিচয়। স্যামুয়েল মল্লিক অতি সতর্কতার অংশ হিসেবে ওদের সাথে নিয়েছে। ফাউল মিয়া পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলো। যাক, কেউ আটকালে এরা তাদের ফেরাতে পারবে। ওর চট করে মনে পড়ে গেল বন্ধু আহিরের কথা। ও যদি বাধা দিতে আসে, তাহলে? এই গুণ্ডাপাণ্ডারাতো ওকে ভর্তা বানিয়ে ফেলবে।

থাক, সে এসব নিয়ে ভাবতে চায় না। আগে নিজের জীবন, টাকা পয়সা। বন্ধু অনেক পরে। টাকা থাকলে বন্ধু জুটিয়ে নেয়া কোনো ব্যাপারই না। সে একটা ক্রুর হাসি দিল। তবে তা দেখল না কেউ। মনে মনে খুশিই হলো ফাউল মিয়া।

কই চলেন আমরা বেরিয়ে পড়ি। স্যামুয়েল মল্লিক তাড়া দিলেন ফাউল মিয়াকে।

স্যার, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

সেটা না হয় নাইবা জানলেন। জবাব শুনে ফাউল মিয়া কিছু বলল না। ব্যাগ তুলে কাঁধে ঝোলালো। কফিন ও অন্যান্য লাগেজ নিল ওই ষণ্ডামার্কা লোকগুলো।

আগেই হোটেলের বাইরে বেরিয়ে গেছে স্যামুয়েল মল্লিক। ফাউল মিয়া ওদের পেছনে পড়ে গেছে। সে তাড়াহুড়ো করে হোটেলের দরজা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াল। হোটেলের সামনে কয়েকজন পুলিশ ঘোরাফেরা করছে। পুলিশ থাকতেই পারে। ব্যাপারটাকে সে মোটেও পাত্তা দিল না।

তাদের সামনে এসে একটা মাইক্রোবাস দাঁড়াল।

ওই ষণ্ডাগুলো গাড়িতে ওঠেনি। সবার আগে ওরা ফাউল মিয়াকে উঠতে বলছে। সে ওদের কথা মতো গাড়ির দরজার হাতলে হাত দিয়ে টান দেবে এমন সময় তার কাঁধে কে যেন হাত দিল।

ফাউল মিয়া দরজা না টেনে দেখে নিতে চাইল কে তার কাঁধে হাত দিয়েছে। তার ধারণা, হয় স্যামুয়েল মল্লিক না হয় ওরা কেউ হবে। তারপরও কৌতূহল মেটানোর জন্য সে কাঁধে হাত দেয়া ব্যক্তির দিকে চাইল। চোখ তুলে তাকাতেই সে যেন শক খাওয়া মানুষের মতো ছিটকে পড়ল খানিকটা দূরে। সাথে সাথেই বেজে উঠল বাঁশি। পুলিশের বাঁশি।

ফাউল মিয়ার সামনে আহির দাঁড়িয়ে। দূরে দাঁড়ানো লোকটাকে সে চিনতে পারল না, ওই লোক পুলিশের সাথে কথা বলছে। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ তাদের ঘিরে ফেলল। ফাউল মিয়া লা জবাব। পুলিশ চোখের পলকে ওই ৫জন আর ওদের দু'জনকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে ফেলল।

বিনা বাধায় পুলিশ সবাইকে ধরে ফেলেছে। ওই ষণ্ডাগুলো কিছু বুঝে ওটার আগেই দেখে সবার হাতে হাতকড়া। স্যামুয়েল মল্লিক কোনো কথা না বলে ওদের সাথে পুলিশের গাড়িতে উঠে বসেছে। কেবল গাড়িতে ওঠেনি ফাউল মিয়া। সে আহিরের সামনে এসে দাঁড়াল। তার চেহারায় হতাশার ছাপ। বিধ্বস্ত শরীর। ধরা গলায় কেবল একটাই শব্দ বেরুল তার গলা দিয়ে

তুই?

হ্যাঁ দোস্ত, আমি। আহির বলল। এই তাহলে আমার সেই বোকাসোকা ভোলা ভালা আপাদমস্তক ভালো মানুষ বন্ধু ফাউল মিয়া। যে চুরি করেছে বিশ্বের সব কম্পিউটার অচল করে ফেলার মন্ত্র। তারপর তার নিজেরই লোভ জেগেছে সেই মন্ত্র বেঁচে সে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার মালিক হবে, তাই না?

ফাউল মিয়া কোনো কথা না বলল না। ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকাল আহিরের দিকে। তারপর সে পুলিশের গাড়িতে গিয়ে বসল।

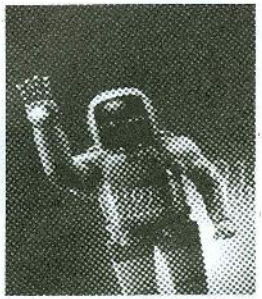

এরপরের কাহিনী একেবারেই সরল। মালয়েশিয়ায় এলো ইউএস পুলিশ, এফবিআই এজেন্টরা। বিল গেটস আসেননি। তাদের সামনেই আসিমোর মাথার ভেতর থেকে বের করা হলো সেই সিডি। সিডি ওপেন করে পাওয়া গেল একটা কোড। কোড নাম্বার হলো : ০১০১০১০১০১০ এই এগারোটা অংক। এই কোড আহিরকে ভাঙতে বলা হলো।

আহির ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় তা ভেঙে ফেলে। কোড ভেঙে ওর ভেতর থেকে উদ্ধার করা হলো সেই বিস্ময় জাগানো একটি বাক্য ডেট লাইন : ০০ ০০ ২০২৫। ২০২৫ সালের জিরো আওয়ারে এই কোডটা সচল হলে সারা বিশ্বের সব কম্পিউটার একযোগে নষ্ট হয়ে যেত। নাসির আলীর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো 'কি সাংঘাতিক' কথাটা।

আহির মিষ্টি করে হেসে ওই ডেট লাইনের প্রোগ্রামিং কোডটা মুছে ফেলল।

মুছে ফেলার পরে ওতে লেখা উঠল ডেট লাইন : ০০ ০০ ০০০০

পুলিশ, এফবিআই এজেন্ট, নাসির আলী ও মালয়েশীয় সরকারের উপস্থিত কর্মকর্তারা আহিরের পিঠ চাপড়ে বাংলাদেশের প্রশংসা করলেন। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে গেল সবখানে। মালয়েশীয় সরকার আহিরের জন্য মোটা অংকের পুরস্কার ঘোষণা করল।

তাকে পুরস্কৃত করা এবং সংবর্ধনা দেবার আয়োজন করল বাংলাদেশ সরকার। যুক্তরাষ্ট্র সরকারও তাকে আমন্ত্রণ জানালো সে দেশে বেড়াতে যাবার জন্য, রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে। নাসির আলীকে বিভিন্নভাবে সম্মানীত করল তারা।

পরদিন বিশ্বের সব দেশে খবরের কাগজের প্রধান শিরোনাম হলো আহির ও যন্ত্রমানব আসিমোর কথা। টিভি চ্যানেলগুলো লাইভ দেখালো। বিল গেটস ওসব কিছুই দেখলেন না। তিনি সারারাত নির্ঘুম কাটালেন। দুশ্চিন্তায় তার চোয়াল ঝুলে গেছে। একদিনেই তার বয়স বেড়ে গেছে ২৫ বছর। খুব সকালে তিনি মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট নিয়ে পড়তে বসলেন। তাতে লিড করা হয়েছে গতকালকের আলোচিত খবরটা...

**ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচলো বিশ্বের সব কম্পিউটার, খলনায়ক বিল গেটস**

বিশ্বের তাবৎ কম্পিউটার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বিশ্বের শীর্ষ ধনী বিল গেটস বিশ্বের সব কম্পিউটার ধ্বংস করে তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বের অধিপতি হতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাংলাদেশের এক তরুণ কম্পিউটার প্রোগামার আহির আবেদ তা হতে দেননি। তিনি বিল গেটসের এই জারিজুরি ফাঁস করে দিয়ে বিশ্বের হিরো বনে গেছেন। আলোচনা-প্রচারণায় তিনিই এখন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি। বিল গেসটের দোসর রোবট মানব আসিমো তাকে এ কুপরামর্শ দিয়েছিল। ওই রোবট আসিমোকেও ইউএস পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়েছে। রোবট আসিমোকে একটি নির্দিষ্ট দিনে ধ্বংস করে ফেলা হবে। তার আগে তাকেও আইনি প্রক্রিয়া পার হতে হবে।

রোবট আসিমোকে চুরির নায়ক ফাউল মিয়া ও তার বস স্যামুয়েল মল্লিককে মালয়েশিয়ান পুলিশ গ্রেফতার করে ইউএস পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। সাথে গ্রেফতার করেছে পাঁচ তামিলকে।

রোবট আসিমো জানিয়েছে, সে আহিরের সাথে থেকে সারা জীবন ভালো কাজ করতে চায় এবং বাংলাদেশে থেকে মাইক্রোসফটের চেয়ে বড় কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সে সাহায্য করবে।

তবে তার আগে সার্কিট বদলাতে হবে, নতুন করে আবার প্রোগ্রামিংও করতে হবে।

এফবিআই ও ইউএস পুলিশের সদর দপ্তর জানিয়েছে, তারা বিল গেটসকেও জিজ্ঞাসাবাদ করবে। প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে মামলাও করবে। মামলার বাদী হবে আহির।

বিল গেটস এটুকু পড়ে থেমে গেলেন। তার হাত কাঁপছে। চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। মাথার ভেতরের একটা ভোঁতা যন্ত্রণা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তার কথা বলারও শক্তি নেই। তারপরও তিনি কাকে যেন ডাকলেন। গলা দিয়ে কেবল ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরুল।

তিনি খবরের বাকি অংশটা পড়তে পারলেন না।